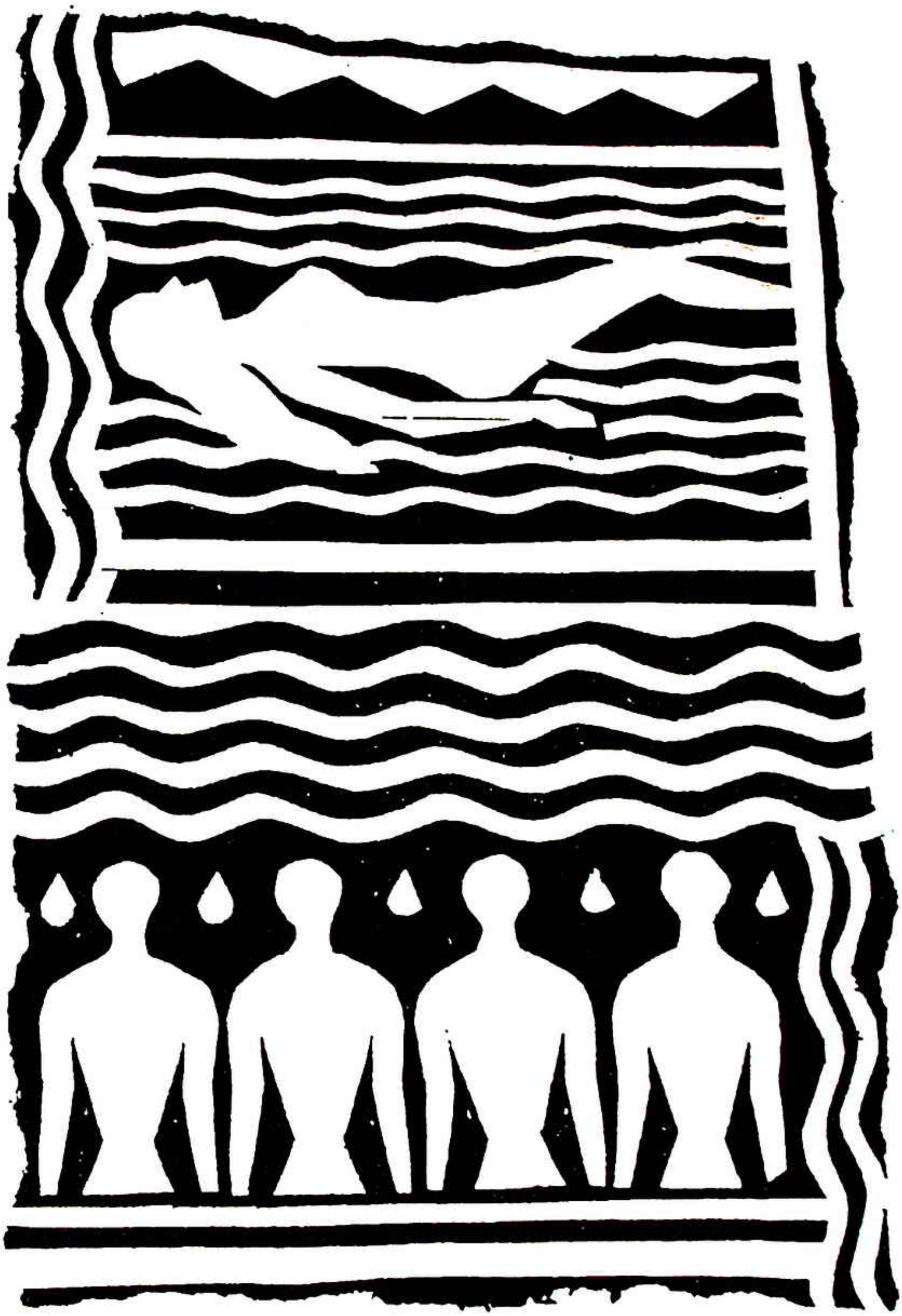

মানবপুত্র

এরকম ঘটনা এই শহরে এর আগে ঘটেনি।

তার আগে শহরটার পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের চেনাশোনা আর পাঁচটা শহরের সঙ্গে এই শহরটির পার্থক্য হল এখানে আইন-শৃঙ্খলা সবাই মানে, বয়স্কদের শ্রদ্ধা করে কনিষ্ঠরা, কারণ এই শহরটিকে ওঁরা নিজেদের রক্ত দিয়েই তৈরি করেছেন বলা যায়। শহরের জন্যে প্রত্যেকেরই মায়া আছে, তাই কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি সচরাচর চোখে পড়ে না। অথচ মাত্র পঞ্চাশ বছর এই শহরটির আয়ু। হিমালয়ের ওপর এমন টাটকা বাতাসের রাজত্বে ছবির মতো এই শহরটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। খুব কাছের সমতলের বড় জংশন স্টেশনে পৌঁছতে বড়জোর ঘণ্টা আড়াই মতো সময় লাগে।

হিমালয়ের এই তল্লাটের আরও কিছু নামী-দামি শহর আছে যেখানে প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ মানুষ আসে ট্যুরিস্ট হয়ে। কিন্তু পাহাড়ি শহরের যত আকর্ষণই থাক না কেন, বেড়াতে আসা মানুষগুলো সেখানে শরীর সারাতে আসে না। প্রথম কথা ঃ পাহাড়ের জল অনেকেরই সহ্য হয় না, দ্বিতীয় ঃ ওইসব শহরে কিছু দিন বেশি থাকা ব্যয়সাপেক্ষ। এই পরিস্থিতিতে কী করে যে প্রচারিত হল যে আমাদের নতুন শহরটির চারদিকে যেমন অজস্র লোভনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব নেই, তেমনই এখানকার জল ঠিক আর পাঁচটা পাহাড়ি শহরের চেয়ে চরিত্রে একদম আলাদা। মধুপুর, দেওঘরের মতো এই জলে শরীর সুস্থ হয়। এখানকার হোটেলগুলো মোটেই ব্যয়সাধ্যি নয়। ফলে গত বছর থেকে এখানে ট্যুরিস্টরা আসছে এবং এই শহরের মানুষেরা সারা বছরের খরচ, আশা করা যায় ট্যুরিস্টরাই দিয়ে যাবে। এ বছর ভিড় আরও বেড়েছে কিন্তু এতটুকু বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। ট্যুরিস্টদের কাছে বিভিন্ন হোর্ডিং-এ আবেদন করা হয়, এই শহরটাকে নিজের বলে মনে করুন। এখানকার প্রশাসনব্যবস্থা অত্যন্ত সজাগ। দেশের সরকার ইতিমধ্যে কিছু-কিছু সাহায্য করেছেন বটে তবে তাঁরা এখানকার স্বায়ত্তশাসন যেন অনেকটাই মেনে নিয়েছেন। গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শহরটিকে শাসন করেন। এখন যিনি কমিশনার তিনি সেই আদিযুগ থেকেই শহরে আছেন। নিজের রক্তের মতো মনে করেন এই শহরকে। শহরটির নাম কনকপুর।

সেই শহরে একদিন সকালে কাণ্ডটা ঘটে গেল। সবে ঘুম ভেঙেছে কিন্তু এখনও আলস্য যায়নি। এই রকম ভোরে শহরটার গায়ে কুয়াশার হালকা চাদর জড়ানো থাকে। সেই সময় একটি যুবক প্রায় ছুটতে-ছুটতে থানায় ঢুকল। রিসেপশনের অফিসারটি তখন রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত, তাঁর বদলি অফিসারের অপেক্ষায় ছিলেন। উত্তেজিত যুবকটিকে দেখে কিন্তু সোজা হয়ে বসলেন।

যুবকটি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, অফিসার, আমার স্ত্রীকে বাঁচান।

অফিসার চেয়ারটি দেখিয়ে বললেন, বসুন। কী হয়েছে বলুন!

আমার স্ত্রীকে পাচ্ছি না। ছেলেটির মুখ সাদা। কাল রাত্রে একসঙ্গে শুয়েছি আমরা, ভোরে উঠে আর দেখতে পাচ্ছি না।

অফিসার হাসলেন, আরে মশাই, ভোর তো সবে হল। উনি একলা একটু বেড়াতেও তো যেতে পারেন। নতুন বিয়ে করেছেন বুঝি?

যুবকটি খুব দ্রুত মাথা নাড়ল, না-না, বেড়াতে যায়নি ও। এই দেখুন, টেবিলের ওপর এই চিঠিটা ছিল।

অফিসার হাত বাড়িয়ে চিরকুটটি নিলেন। মেয়েলি অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'এই সম্পর্ক মানতে পারছি না। তুমি এত ভালো তাই তোমাকে ঠকাব না। আমার কথা ভুলে যেয়ো, ক্ষমা চাইছি।'

এবার অফিসার নড়ে-চড়ে বসলেন। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে যুবকটিকে জেরা করতে লাগলেন। এ রকম অভিজ্ঞতার কথা তিনি গল্পের বইতে পড়েছেন। কনকপুরের এমন ঘটনা প্রথম ঘটল।

ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে ম্যাল রোডের ধারে নির্জন বাংলোর লনে সবে চা খেতে-খেতে কমিশনার গুপ্ত মুখ তুলে দেখলেন পুলিশের বড়কর্তা সেন গেটের বাইরে গাড়ি রেখে লনে পা ফেললেন। এত ভোরে ওঁর আসার কোনও অভ্যেস নেই। গুপ্ত কিঞ্চিৎ অবাক হলেও তা প্রকাশ করলেন না। মনের অভিব্যক্তি চেপে রাখায় নিপুণ তিনি। সামনে এসে স্যালুট করে দাঁড়াতেই গুপ্ত নমস্কার জানালেন, বসুন-বসুন, চা খাবেন?

ধন্যবাদ স্যার, আমরা একটু উত্তেজিত। এই শহরে যা কখনও হয়নি আজ তাই হয়েছে। সেন চেয়ারে শরীর রাখতেই বেতের শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল গুপ্তর। এই শহরে কোনও খারাপ কিছু হলে তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তবু গলায় স্বাভাবিক স্বর বের হল, কী হয়েছে?

একটি ট্যুরিস্ট দম্পতি এসে হিমালয় হোটেলে উঠেছিল। সদ্য বিবাহিতা। হানিমুনে এলে যেমন দেখায় তেমনি দেখতে ওদের। আজ সকালে মেয়েটি উধাও হয়েছে একটা চিঠি লিখে রেখে। তা ওই সকালে এখান থেকে নিচে কোনও ট্রান্সপোর্ট যায়নি। তার মানে মেয়েটি এখানেই আছে। ওকে খুঁজে বের করার জন্য লোক পাঠিয়েছি চারধারে। এটা আপনাকে জানানো কর্তব্য বলেই ছুটে এলাম স্যার। সেন নিবেদন করলেন।

চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন গুপ্ত—স্ট্রেঞ্জ। মেয়েটিকে না পাওয়া গেলে শহরের ভীষণ বদনাম হয়ে যাবে। ট্যুরিস্টরা আসতে ভয় পাবে। নো-নো, আজ দুপুরের মধ্যে ওই মেয়েটিকে খুঁজে বের করুন। মনে রাখবেন এটা আমাদের ইজ্জতের ব্যাপার।

সেন বললেন, সে তো নিশ্চয়ই। আমি স্টাফদের বলেছি কনকপুরটাকে চিরুনির মতো আঁচড়াতে। আর হ্যাঁ, ছেলেটিকেও আমি আটকে রেখেছি। বলা যায় না, হয়তো মার্ডার কেস হতে পারে।

পারে। কিন্তু সেটা এই শহরের পক্ষে একটু খারাপ ব্যাপার। এখানে এলে বউ খুন হয় রটে গেলে আবার বিপদ হবে। তেমন খবর আমায় না জানিয়ে প্রেসকে রিলিজ করবেন না। মেয়েটিকে খুঁজে বার করে সমাজপতিকে বলবেন কালকের কাগজের প্রথম পাতায় খবরটা ছাপতে। প্রশাসনের তৎপরতার খবর পড়ে সাধারণ মানুষের আমাদের

ওপর আস্থা বাড়বে। যান, মেয়েটিকে খুঁজে বের করুন। একটু অসহিষ্ণু গলায় কথাগুলো শেষ করে হাত নাড়লেন।

সেন আর অপেক্ষায় থাকলেন না। তিনি ভালো করেই জানেন যে গুপ্ত কোনওমতেই এখন শান্ত থাকবেন না। এই শহরের গায়ে আঁচ লাগছে এমন কিছুকে গুপ্তর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। অতএব মেয়েটিকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সেন চলে গেলে মনে হল আজকের সকালটা খুব বিশ্রী। এত জায়গা থাকতে তোর এখানে এসে হারাবার কী দরকার ছিল! ধরা যাক, ওকে কেউ খুন করেছে। খবরটা রটে গেলে আর ট্যুরিস্ট আসবে? সবাই ভাববে কনকপুরে গেলে মেয়েদের নিরাপত্তা থাকবে না। কত কষ্টে সবদিক আড়াল করে তিল-তিল করে শহরটাকে তৈরি করেছেন। যার জন্যে কোন ফাঁকে বয়স চলে যাওয়ায় বিয়েটা পর্যন্ত করা হল না।

ভারী মনে একটু বাদেই নিজের জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গুপ্ত। বলা যায় না, রাস্তায় আচমকা তাঁর নজরেও পড়ে যেতে পারে মেয়েটা। যদিও তিনি ওকে চেনেন না, ছবিও দেখেননি, কিন্তু ওইরকম পালানে মেয়েদের দেখলেই তিনি চিনতে পারবেন বলেই তাঁর বিশ্বাস।

এখন কনকপুর রোদে ভাসছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল গুপ্তর। কত পরিশ্রম এর পিছনে আছে। একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামকে আজ মোটামুটি আধুনিক শহরের চেহারা দেওয়া হল, এক জীবনেই। প্রায় জঙ্গল কেটেই পত্তন। আদিবাসীরা অবশ্যই খুব সন্তুষ্ট নয়, তারা আরও জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে। কিন্তু রুজিরোজগারের জন্যে এখানেই আসতে হয়। নির্জন সকালের রাস্তায় জিপের সামনে বসে কিন্তু খুব স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ ওঁর নজরে পড়ল রাস্তার ধার ঘেঁষে একটি মেয়ে খাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব জোরে জিপ ছুটিয়ে ঠিক মেয়েটির পাশে এসে ব্রেক করতেই সে মুখ ঘোরাল। গুপ্ত মনে-মনে বললেন, যাচ্চলে। তারপর হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, কী খবর? কেমন আছ?

মেয়েটি সামান্য মাথা দুলিয়ে হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি এত সকালে বেরিয়েছেন?

আর বলো না। ছাই ফেলতে তো এই ভাঙা কুলো। তোমার বাবা তো এখন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

গুপ্ত মেয়েটিকে পছন্দ করেন।

মোটেই না। বাবা এখন হাসপাতালে চলে গেছেন—

মেয়েটি প্রতিবাদ করল সহাস্যে।

গুপ্ত বড়-বড় চোখ করলেন, হাসপাতাল! কনকপুরে কারও বড় কোনও অসুখ হয় না। তাই হাসপাতালে বসে তোমার বাবার তো মেডিকেল জার্নাল পড়া ছাড়া কোনও কাজ নেই।

সে আমি জানি না—

কিন্তু ওর মতো সিনসিয়ার মানুষ খুব কম দেখেছি। শোনো, আমার ভাই বলে বলছি না, অপরেশের মতো এমন কাজপাগল মানুষ পৃথিবীতে কমে গেছে বলেই মানুষের এই দুর্দশা। যেই আমি হাসপাতালটা করে ফেললাম, অমনি ওকে টেনে নিয়ে এলাম

এখানে। সবাই ওর প্রশংসা করে কিন্তু ওকে আবিষ্কারের কৃতিত্বটা আমার। তুমি কী বলো? সাগ্রহে তাকালেন গুপ্ত। মেয়েটি সলাজুক হাসল, নিশ্চয়ই। বাবার প্রশংসা—

কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে? প্রসঙ্গ পালটালেন গুপ্ত।

স্কুলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাঁদিকে তাকাতেই নিচে কুয়াশাদের গলে যেতে দেখলাম। তাই—

যাচ্চলে! কুয়াশাদের গলে যাওয়া দেখতে পেলে! তোমাদের সবই উদ্ভট। শোনো, একটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসে আমাকে ঝামেলায় ফেলেছে। কোনও মেয়েকে একলা ঘুরতে দেখলেই, যদি সন্দেহ হয়, তক্ষুনি আমাকে খবর দেবে— আর দাঁড়ালেন না গুপ্ত।

তাঁর এই ভাইঝিটি খুব শান্ত। এম. এ. পাশ করে বসেছিল। তিনি এখানকার একমাত্র স্কুলে চাকরি করে দিয়েছেন। তাঁর এই ভাইটি ছন্নছাড়া। কোনও চাকরিতে বেশি দিন টিকতে পারেনি পিটপিটুনি স্বভাবের জন্য। শেষমেশ পুরুলিয়ার এক গ্রামে প্র্যাকটিস করছিল। দু-বেলা পেট ভরে ভাত জুটত না কারণ ফি-এর টাকাটা পকেটেই আসত না।

হাসপাতালের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিচে নামলেন গুপ্ত। ওঁকে দেখে কর্মচারীরা তটস্থ। না, চেম্বারে অপরেশ নেই। বেয়ারা বলল, সে নাকি ওয়ার্ডে। গুপ্ত সেখানেই চললেন। ওষুধের কড়া গন্ধ তিনি সহ্য করতে পারেন না। যেতে-যেতে দেখলেন প্যাসেজে একটা কাগজ পড়ে আছে। বিরক্ত ভঙ্গিতে সেটাকে তুলে নিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে ওয়ার্ডে ঢুকলেন।

অপরেশ ঝুঁকে পড়ে একজন রুগির সঙ্গে কথা বলছেন।

গুপ্ত দেখলেন কোনও বেডই খালি নেই। তবে দেহাতিদের সংখ্যাই বেশি। গুপ্তকে দেখে অপরেশ এগিয়ে এলেন, কী ব্যাপার?

এত রুগি কেন?

বাঃ, অসুখ হলে চিকিৎসার জন্যে আসবে না?

গুপ্ত অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, না-না, এ ভালো কথা নয়। একটা শহরের জলহাওয়া কীরকম তা বোঝা যায় সেখানকার হাসপাতালের রুগির সংখ্যার ওপর। আদিবাসীদের কথা আমি ধরছি না, কিন্তু ওখানে তো কিছু—! কথা শেষ না করে গুপ্ত দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন।

আপনার নাম?

মোটাসোটা ভদ্রলোকটি শুয়ে ছিলেন চোখ খুলে, নাম বললেন।

আপনি এখানকার লোক?

না, বেড়াতে এসেছিলাম এখানে। পেটে এত যন্ত্রণা হচ্ছে ওঃ! আগেও ছিল—

গুপ্তর মুখ উদ্ভাসিত হল। অপরেশের কাছে ফিরে এসে বললেন, না, আমাদের দোষ নেই। এরা সব শরীরে রোগ নিয়েই এখানে এসেছে। তবে হ্যাঁ, এ খবর যেন বাইরে না বের হয়। লোকে ভাববে এখানকার জলেরই দোষ। একবার রটে গেলে আর ট্যুরিস্ট আসবে না এখানে।

অপরেশ কী একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। অস্বস্তি হলেই উনি চশমা

খুলে ফেলেন। গুপ্তর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতেই অবিনাশকে চোখে পড়ল। এই শহরের সত্যি উদ্যমী সাংবাদিক। সব সময় কাঁধে ক্যামেরা আর হাতে নোট বই নিয়ে ঘোরে। গুপ্ত ওকে ঠিক পছন্দ না করলেও অপরেশের বেশ ভালো লাগে। ওর মালিক-সম্পাদক সমাজপতিটা অবশ্য ধান্দাবাজ লোক।

সুপ্রভাত স্যার। সুপ্রভাত ডাক্তারবাবু। অবিনাশ একগাল হাসল। হাসপাতালে কী মনে করে? গুপ্ত থমকে দাঁড়ালেন। ওর দিকে তাকালেন। বাইরে আপনার গাড়িটাকে দেখে ভাবলাম ডেডবডি এসে গিয়েছে বুঝি! একবার দেখতে পারি ডাক্তারবাবু? শুনেছি মেয়েটি নাকি খুব সুন্দরী।

অবিনাশ অপরেশকে অনুরোধ জানাল।

ডেডবডি! হকচকিয়ে গেলেন অপরেশ।

গুপ্ত গর্জে উঠলেন, কী আজেবাজে কথা বলছ? এখানে কোনও ডেডবডি আসেনি। কনকপুরের কোনও মেয়ে খামোকা মরতে যাবে কেন?

অবিনাশ মাথা নাড়ল, কিন্তু স্যার, মেয়েটি তো ওই রকম লিখেই হাওয়া হয়েছে। আপনাকে এখানে দেখে মনে হল হয়তো—

অপরেশ ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না। তিনি দাদার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে?

গুপ্ত সামান্য ইতস্তত করে বললেন, একটি মেয়ে এখানে বেড়াতে এসে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে, মান-অভিমানের ব্যাপার আর কী! তা তুমি এই সক্কালবেলায় খবরটা পেলে কী করে? অবিনাশ হাসল, সাংবাদিককে সোর্স জিজ্ঞাসা করবেন না স্যার।

সাংবাদিক! যা না কাগজ তার আবার সাংবাদিক! তোমাকে তো পত্রিকা ডেলিভারিও দিতে হয়। গুপ্ত নাক টানলেন।

স্যার! কাগজ তুলে কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

অপরেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, বেশ-বেশ। শোনো হে অবিনাশ, আমার এখানে কোনও ডেডবডি আসেনি।

অবিনাশ ঘুরে দাঁড়াল, ব্যস। চুকে গেল ল্যাঠা। আপনার গাড়িটাকে দেখে সন্দেহ হয়েছিল তাই ঢুঁ মারলাম। অবিনাশ চলে যাচ্ছিল, গুপ্ত তাকে ডাকলেন, কোন দিকে যাবে?

অবিনাশ হাসল, বাজারে।

ওইখানে এক মিনিট দাঁড়াও। আমার গাড়িতে যেতে পারবে। কথাটা বলে গুপ্ত অপরেশকে চাপা গলায় বললেন, শোনো, সত্যি যদি কোনও ডেডবডি আসে তাহলে আমাকে না জানিয়ে কাউকে কিছু বলবে না। আর ওই ট্যুরিস্টদের যত তাড়াতাড়ি পারো হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দাও।

অপরেশ মাথা নাড়লেন, কিন্তু ওদের দুজনের যে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করা দরকার। ছেড়ে দেব কী করে?

গুপ্ত গম্ভীর গলায় বললেন, নিজের দেশে গিয়ে করাক। পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র ডাক্তার নও।

গুপ্ত অবিনাশকে নিয়ে গাড়িতে উঠে প্রশ্ন করলেন, রাগ করেছ?

না, আমার এ সব কথা অভ্যাস হয়ে গেছে।

তোমাদের কাগজ শুনছি খুব ভালো চলছে?

চলছে। ট্যুরিস্টরা খুব নিচ্ছে। আশেপাশের শহরেও যাচ্ছে।

ভালো, আমি চাই আমাদের এই শহর সব বিষয়ে স্বয়ং-নির্ভর হোক। কিন্তু সমাজপতি আমার কথা শুনছে না। আমি বলেছিলাম এই শহরের প্রশংসা করে কাগজে আরও বেশি লেখা হোক। তুমি ওকে বলো।

বলব, কিন্তু এই তো গতকালই ডাক্তারের আর্টিকেল বের হল এই শহরের পরিবেশ নিয়ে। পড়েছেন? অবিনাশ বলল।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুপ্ত জবাব দিলেন, পড়েছি। ও তো শুধু উপদেশ আর তথ্য। লোকে ইন্টারেস্ট পায় না। তুমি একটু জম্পেশ করে লেখো।

ট্যুরিস্ট মেয়েদের ছবি-টবি ছাপাও। আর যত বেশি ট্যুরিস্ট আসবে তত তোমার কাগজ বিক্রি হবে। আর হ্যাঁ, ওই মেয়েটিকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কোনও নিউজ তুমি লিখে বসো না যেন।

বিকেলে অপরেশ একটু বেড়াতে বের হলেন। সারাদিন এই একটিবার হাঁটাহাঁটি হয়। খুব জরুরি প্রয়োজন না থাকলে ওঁকে বিকেলের পর হাসপাতালে যেতে হয় না। অপারেশন কেস থাকলে রাত্রে একবার ঘুরে আসেন।

সেজেগুজে বাইরের ঘরে আসতেই সুর্মা বলে উঠল, বাবা তুমি মাঙ্কি ক্যাপ পরোনি। ওটা না পরে কিন্তু বেরিও না।

অপরেশ একটু অসহায় ভঙ্গিতে তাকালেন। মাঙ্কি ক্যাপ তিনি একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু মেয়েটা এমন গার্জেনগিরি করে! এই সময় কাজল ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন টুপিটা হাতে করে—নাও। অপরেশ বাধ্য হলেন। এখানে আসার পর তিনি কাজলকে অন্য রকম দেখছেন। এই সুন্দর কোয়ার্টার্স, ফুলের বাগান নিয়ে বেশ খুশিতে আছে ও। এত বছরের বিবাহিত-জীবনে কাজলকে এত প্রাণবন্ত তিনি খুবই কম দেখেছেন।

হঠাৎ সুর্মা বলে উঠল, জানো বাবা, আজ একটা ট্যুরিস্ট বউ এখানে হারিয়ে গেছে।

কাজলের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, ও মা তুই জানলি কী করে?

সুর্মা বলল, ভোরে যখন স্কুলে যাচ্ছিলাম তখন জেঠুর সঙ্গে দেখা হল। খুব ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। উনিই বললেন। জেঠু এই শহরটাকে যা ভালোবাসেন না, যেন নিজের শরীরের চেয়ে দামি।

কাজল বললেন, মেয়েটি কোথায় যাবে! এইটুকু তো শহর।

সুর্মা বলল, খবরটা এখনও চাউর হয়নি। তা এবার কিন্তু খুব ট্যুরিস্ট আসছে এখানে। রাস্তায় পা দিলেই নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি।

অপরেশ একটু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, এবার ট্যুরিস্টরা অসুখেও পড়ছে বেশ। সব পেটের গোলমাল। আজই বিকেলে দুজন নতুন পেশেন্ট হাসপাতালে ভরতি হয়েছে।

কাজল বললেন, ও মা, সে কী কথা! এখানে তো পেটের গোলমাল হয় না

বলে শুনেছি। তোমার দাদা বলেন এখানকার জল নাকি অমৃত।

অমৃত কি না জানি না তবে ফুটিয়ে নিচ্ছ তো?

খাবার জল রোজই ফোটানো হয়। তোমার বাপু একটু বেশি পিটপিটুনি স্বভাব। এত লোক জলের প্রশংসা করছে আর তুমি—। কাজল কথাটা শেষ করলেন না। ওঁর নজর তখন বাইরের গেটের দিকে। ঘরে দাঁড়িয়েই জানালা দিয়ে বাগান, গেল দেখা যায়। দরজায় তখন বেশ সুন্দর চেহারার এক যুবক এসে দাঁড়িয়েছে। বললেন, এসো বাবা, এসো।

যুবক বলল, ভালো আছেন আপনারা?

অপরেশ মাথা নাড়লেন, ভালো নেই। আজ বিকেলে আবার পেটের রুগির সংখ্যা বেড়েছে হাসপাতালে।

কাজল কপট গলায় ধমক দিলেন, আঃ, সব সময় হাসপাতাল আর হাসপাতাল। অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসে না, বসো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

যুবক সুর্মার দিকে তাকিয়ে হাসল। বোঝা যায় এদের দুজনের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া হচ্ছে। যুবক বলল, আপনি বের হচ্ছেন মনে হচ্ছে?

অপরেশ ঘড়ি দেখলেন—হ্যাঁ, বেশ দেরি হয়ে গেছে। যাই এক চক্কর ঘুরে আসি। তা, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে?

ভালো। আমরা নিচের দিকে জমিটা পেয়ে গেছি। টাউন কমিটি স্যাংশন করেছে। শিগগির কাজ শুরু করব। যুবক বলল।

যুবকের নাম সুব্রত। পেশায় সে ইঞ্জিনিয়ার। কনকপুর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সে অধিকর্তা। এই অল্পবয়সে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে এত ভালো চাকরি পেয়েছে। সুব্রতর বাবা এই শহরের প্রথম নাগরিকদের অন্যতম। মা-মরা এই ছেলেটি এতদিন হোস্টেলে-হোস্টেলে দিন কাটিয়ে আবার নিজের শহরে ফিরে এসেছে।

ওদের বাড়িতে রেখে অপরেশ বেরিয়ে এলেন। এখনও রোদ মরেনি। তবে যে-কোনও মুহূর্তে ছায়ারা ছড়িয়ে পড়বে। পশ্চিমের পাহাড়গুলো বেশ লালচে হয়ে পড়েছে। রাস্তায় ট্যুরিস্টদের বেশ ভিড়। চৌমাথায় কন্ডাকটেড ট্যুরের অফিসগুলোর সামনে মানুষের খুব আনাগোনা। কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফাঁদে ট্যুরিস্টদের না ফেলে কনকপুর ডেভেলপমেন্ট নিজে থেকেই ট্যুরিস্টদের বিভিন্ন বিউটি-স্পট ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। কে. ডি. সি. লেখা গাড়িগুলো সারাদিন ছোটাছুটি করছে চারধারে।

অপরেশ ডেয়ারি ফার্ম ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে আসতেই অবিনাশকে দেখতে পেলেন। গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ওপাশ থেকে নেমে আসছে। ওকে দেখে চিৎকার করল ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু!

অপরেশ দাঁড়ালেন। অবিনাশ দৌড়ে কাছাকাছি হল—কোথায় যাচ্ছেন? বেড়াতে!

এখুনি তো সন্ধে হয়ে যাবে।

তা তো যাবেই। মেয়েটির কোনও খোঁজ পেয়েছ?

না, স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে। কী করে স্যার কে জানে!

তুমি এখানে কী করছ?

অবিনাশ প্রশ্নটা শুনে হকচকিয়ে গেল। তারপর নার্ভাস-হাসি হাসল—এই একটু ছবি তুলছিলাম।

এদিকে আবার কীসের ছবি?

একটু ইতস্তত করল অবিনাশ। তারপর অপরেশকে খুঁটিয়ে দেখল—আপনাকে কথাটা বলছি। ওপরে মিস্টার দাশগুপ্তর যে কারখানাটা রয়েছে ওটা নাকি বেআইনিভাবে তৈরি। সুব্রত ইঞ্জিনিয়ার এই রকম একটা রিপোর্ট দিয়েছে গুপ্ত সাহেবকে। কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ ধামাচাপা পড়ে গেছে। আপনি তো পরিবেশ দূষিত করার ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন আমাদের কাগজে, এই ব্যাপারে লিখুন না।

অপরেশ চমকে উঠলেন। শহরের মুখটাতে এমন একটা বড় কারখানা রয়েছে এটা তাঁর নিজেরই পছন্দ হয়নি। কিন্তু ওটা যে বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে এ খবর তিনি জানতেন না। যদিও কারখানা থেকে ধোঁয়া চারধারে ছড়ায় না তবু বেআইনি যখন, তখন অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা উচিত। কিন্তু বেআইনি কেন? প্রশ্নটা করলেন তিনি।

অবিনাশ বলল, এই অঞ্চলটা হাউসিং প্লট, ফ্যাক্টরির জন্যে নয়। কিন্তু দাশগুপ্ত সাহেব এখানেই ফ্যাক্টরি বানিয়েছেন। কনকপুর ডেভেলপমেন্টের উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। গুপ্তসাহেবের আত্মীয়, অতএব ওঁকে কে স্পর্শ করবে? কথাটা বলেই অবিনাশের খেয়াল হল দাশগুপ্ত অপরেশেরও পরম আত্মীয়। এখন হিতে বিপরীত না হয়।

অপরেশ বললেন, চলো তো ফ্যাক্টরিটা দেখে আসি।

অবিনাশ সাহস পেল না—না, আমি আর যাব না। এইমাত্র ছবি তুলে এলাম, আর যাওয়া ঠিক হবে না।

ফ্যাক্টরির ছবি তুলেছ?

হ্যাঁ।

বেশ। আমি দেখে নিই ব্যাপারটা। তারপর কাগজে লিখব। তখন ছবিটা সঙ্গে ছেপে দিও। অপরেশ মাথা নাড়লেন।

উদ্ভাসিত হল অবিনাশ, ওফ! দারুণ হবে। একদম মৌচাকে ঢিল পড়বে। দারুণ খাবে পাবলিক। হুহু করে কাগজের সেল বেড়ে যাবে।

অপরেশ গম্ভীর গলায় বললেন, যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানুষের কর্তব্য। একটি খবরের কাগজের তা-ই চরিত্র হওয়া দরকার। তোমাদের মুশকিল হল ব্যবসা ছাড়া তোমরা কিছু বোঝ না।

অবিনাশকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে অপরেশ আবার হাঁটতে লাগলেন। ডানদিকের পথটা ঘুরে উঠে গেছে ওপরে। সেখানেই দাশগুপ্তর ফ্যাক্টরি। অপরেশের খেয়াল হল একটু বাদেই সন্ধে হয়ে যাবে। তাহলে যে উদ্দেশ্যে এদিকে আসা, সেটা করা শক্ত হয়ে যাবে। রাত্রে তিনি চোখে একটু কম দেখেন। আলো থাকতে-থাকতেই সেখানে পৌঁছানো দরকার। অপরেশ ঠিক করলেন ফেরার পথে তিনি ফ্যাক্টরিটা দেখে আসবেন।

প্রায় আধমাইল উঠে এসে তিনি হাঁপাতে লাগলেন। এখন বেশ ঠান্ডা পড়েছে। ছায়ায় আর আলো মাখা নেই। একটু বিশ্রাম নিয়ে অপরেশ ধীরে-ধীরে ওপরে আসতেই

চোখ জুড়িয়ে গেল। বিরাট এলাকা জুড়ে জলরাশি টলটল করছে। চমৎকার বাঁধ এই জলকে ঘিরে রেখেছে। ঠিক বাঁধের নিচে ওই জল পরিশ্রুত করে কনকপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। অপরেশ জানেন, এই বিরাট জলাধার পাহারা দেওয়া হয়। রক্ষীরা দশ মিনিট অন্তর বাঁধের ওপর দিয়ে পাক খায়।

অপরেশ সতর্ক হলেন। জায়গাটা নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে ঘোষিত। বিনা অনুমতিতে এখানে আসা নিষেধ। অপরেশকে রক্ষীরা চেনে। তাঁকে দেখলে ওঁরা কিছু বলবে না কিন্তু খবরটা কানাকানি হতে পারে। এই সময় দূরে দুজন রক্ষীকে দেখতে পেয়ে অপরেশ দ্রুত একটা পিলারের পিছনে সরে দাঁড়ালেন। ওরা যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে যায় ততক্ষণ তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দুপাশ দেখে নিয়ে সতর্ক পায়ে বাঁধ থেকে নিচে জলের ধারে চলে এলেন। অন্ধকার এখন জলের ওপরে, আকাশের পায়ে। কনকনে হাওয়ারা হঠাৎ ছুটে এল পাহাড়ের শরীর থেকে। অপরেশ পকেট থেকে বড় বোতল বের করে নিচু হয়ে লেকের জল ভরতে লাগলেন তাতে। প্রায় গলা অবধি ভরে গেলে বোতলের মুখ আটকে চোখ তুলতেই মনে হল লেকের মাঝখানে কিছু ভাসছে। হয়তো কোনও গাছের ডাল বা কাঠ স্থির হয়ে আছে। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ল এই লেকের জলে তো ও-সব কিছু পড়ে থাকার কথা নয়। রক্ষীরা সারা দিন-রাত নজর রাখে যাতে লেকের জলে আবর্জনা না পড়ে। লোকগুলো নির্ঘাৎ ফাঁকি দিচ্ছে।

অপরেশ আবার নজর করবার চেষ্টা করলেন। আবছা আঁধারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ ওঁর শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল। মানুষের শরীর মনে হচ্ছে! ওটা কি দুটো পা! চকিতে ওপরটা দেখে নিলেন। না, রক্ষীরা এখনও ফিরে আসেনি। দ্রুত বাঁধের ওপর ছুটে এলেন তিনি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও জিনিসটা স্পষ্ট হল না, কিন্তু অপরেশের সন্দেহ দৃঢ় হল, ওটি মানুষের মৃতদেহ।

বাঁধ থেকে নিচে নেমে জোরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। ওখানে কোনও মানুষের শরীর যাবে কী করে? কাউকে মেরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে? তাহলে তো রক্ষীরা টের পেত! পেত কি? এই যে তিনি চুপিচুপি গিয়ে জল নিয়ে এলেন ওরা জানতেও পারল না! দাদা খুব বড়াই করেন তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে, এই তো হাল। অবশ্য কেউ যদি চুপিচুপি আত্মহত্যা করতে জলে ডোবে তবে—! হ্যাঁ, সেইটেই স্বাভাবিক। অপরেশের মাথায় চমকে উঠল অবিনাশের কথাটা। সেই ট্যুরিস্ট বউটির শরীর নয় তো? সকালে যদি ডুবে যায় সন্ধেবেলায় তার শরীর ভাসতে পারে? কাল রাত্রেও ডুবতে পারে যখন ওর স্বামী ঘুমুচ্ছিল!

খবরটা গুপ্তকে দেওয়ার জন্যে অপরেশ শর্টকাটের রাস্তা ধরলেন। ওঁর কোটের পকেটে বোতলটা নড়ছে চলার ছন্দে। কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, কনকপুরের জলটা পরীক্ষা করা দরকার। ট্যুরিস্টরা এখানে এসে একমাত্র পেটের অসুখেই ভুগছে কেন? আগে তো এমন হতো না। বরং কনকপুরে জলের সুখ্যাতি সর্বত্র। অথচ ওই পেটের অসুখ হওয়াটা সবে শুরু হয়েছে। প্রথমে ট্যুরিস্টরা আক্রান্ত হবে। কী জন্যে এ রকম হচ্ছে এখনও জানেন না অপরেশ। শহরের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে এর কারণ জানা তাঁর কর্তব্য। প্রথমেই সন্দেহ এসেছে জলের ওপর। দেখা যাক এই জল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

কি না!

চলতে-চলতে কখন যে ফ্যাক্টরির সামনে এসে পড়েছেন নিজেরই খেয়াল ছিল না। মেইন গেটে আলো জ্বলছে, বিরাট ফ্যাক্টরি এখন চুপচাপ। মৃত জন্তুর শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে এখানে তা দিয়ে অনেক কিছু তৈরি হয়। একটা উৎকট গন্ধে চারদিকের বাতাস ভারী। ফ্যাক্টরির মালিককে কোনও দিনই তিনি পছন্দ করেন না। যদিও তিনি অপরেশের ভায়রাভাই, তবু সম্পর্কটা গুপ্তর সঙ্গেই তাঁর বেশি। ওঁদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে যখন যান তখন যেন রাজা-বাদশা এসেছে এমন ভঙ্গিতে কাজল তার জামাই-বাবুকে খাতির করে। দেখে গা জ্বলে যায় অপরেশের। শুধু চামড়া বেচে পেট মোটা করছে লোকটা।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন অপরেশ। এখান থেকেই দাদাকে টেলিফোন করে নেওয়া যায়। সন্ধে হয়ে গেছে, এখন অতটা রাস্তা হাঁটতে তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল না। চৌকিদার ওঁকে দেখে এগিয়ে এসে সেলাম করল। অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, সাহেব আছেন?

নেই সাব। আভি-আভি ক্লাবমে গিয়া। লোকটা তাঁকে চেনে, সসম্ভ্রমে কথাটা জানাল।

বছরখানেক হল কনকপুরে একটি সান্ধ্য ক্লাব হয়েছে। বেশ মোটা চাঁদা দিয়ে লোকে সেখানে তাস খেলে, মদ খায়। সেখানে ঢোকার সুযোগ তাঁর কোনও দিন হবে না। ওখানকার সদস্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। অপরেশ চৌকিদারকে বললেন, আমার একটা জরুরি টেলিফোন করা দরকার। ফোন কোথায় আছে?

একটু ইতস্তত করে লোকটা তাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দিল। জানলার কাছে টেলিফোন! কনকপুরে টেলিফোন চলে অপারেটারদের সহযোগিতায়। গুপ্তর বাড়ির লাইন চাইলেন অপরেশ। একটি লোক সাড়া দিতে অপরেশ নিজের পরিচয় দিলেন। গুপ্ত বাড়িতে নেই, কোথায় গেছে কেউ জানে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে অপরেশনের মনে হল ক্লাবে আছেন কি না দেখা দরকার। ক্লাবেই পাওয়া গেল গুপ্তকে। গলাটা একটু ভারী এবং বিরক্ত—কী ব্যাপার, হঠাৎ টেলিফোন?

অপরেশ বললেন, আমি বিকেলে বেড়াতে এসেছিলাম লেকের দিকে। সন্ধে হয়ে এসেছিল, ভালো করে ঠাওর করতে পারিনি কিন্তু মনে হল লেকের জলে কিছু একটা ভাসছে।

গুপ্তর গলাটা তিরিক্ষি হল—কী ভাসছে?

মানুষের শরীর বলে সন্দেহ হচ্ছে।

ইম্পসিবল! তুমি ঠিক দেখেছ?

একটু সন্দেহ আছে। অন্ধকার হয়ে এসেছিল!

ঠিক আছে, আমি দেখছি। সন্দেহটা সত্যি হওয়ার আগে শহরময় বলে বেড়িও না। কোত্থেকে কথা বলছ?

দাশগুপ্তর ফ্যাক্টরি থেকে। ফেরার পথে এখানেই টেলিফোন আছে।

হুম! তুমি এখন কোথায় যাবে?

হাসপাতালে হয়ে বাড়ি।

হোয়াই? হাসপাতালে কেন?

বিকেলে আবার কিছু পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। দেখে যাই।

ট্যুরিস্ট?

হ্যাঁ। পেটের রোগ। আর-একটা কথা, আমার মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘোষণা করা দরকার, এই শহরের সবাই যেন জল ফুটিয়ে খায়। মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য।

আঃ! দু-তিনজনের কী-না-কী হয়েছে আর শহরসুদ্ধ লোককে প্যানিকি করে ছাড়বে! ও সব করলে কাল সকালেই ট্যুরিস্টরা পালাবে। এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। রাখছি। খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখা শব্দ হল ওপাশে।

অপরেশ একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। দাদা এই সমস্যাটার প্রকৃত চেহারাটা বুঝতেই পারল না। মহামারী হয়তো হবে না কিন্তু একটু-একটু করে একদিন এই শহরের মানুষগুলো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। এরকম সন্দেহ কদিন থেকেই হচ্ছে কিন্তু প্রমাণ নেই বলে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেন না। জানলা দিয়ে তাকাতেই দূরে মোটা-মোটা পাইপ দেখতে পেলেন। পাশাপাশি দুটো পাইপ ওপরের পাহাড় থেকে নেমে এসে ফ্যাক্টরির তলা দিয়ে চলে গেছে।

ওগুলো কীসের পাইপ? বাইরে বেরিয়ে এসে চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলেন অপরেশ।

পানিকা পাইপ সাব। লেকসে নিকালকে টাউনমে যাতা হ্যায়। চৌকিদার অপরেশের অজ্ঞতায় যেন খুশি হল।

অপরেশ মাথা নাড়লেন। তারপর আস্তে-আস্তে ফ্যাক্টরি ছেড়ে বড়রাস্তা ধরলেন। বেশ কিছুটা নেমে মুখ ঘুরিয়ে আর পাইপটাকে দেখতে পেলেন না। ও দুটো মাটির তলা দিয়ে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে! অপরেশ দেখলেন দূরে একটা মুদির দোকানে আলো জ্বলছে। দ্রুত পা চালালেন, ওখান থেকে আরও খালি বোতল নিতে হবে।

পেটের রোগে আক্রান্ত মানুষের আনাগোনা কমছে না। রোজই চার-পাঁচ জন করে লেগেই আছে। অপরেশ এখন খুবই উদ্বিগ্ন। রোজই ডাকের খোঁজ নেন। কলকাতা থেকে দুটো চিঠি যে-কোনওদিন আসতে পারে কিন্তু কেন যে আসছে না! গুপ্ত ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্ব দিতেই রাজি নন। শরীর থাকলেই অসুখ-বিসুখ হবে। এত বড় শহরের মাত্র জনাকয়েক লোকের পেটের অসুখ মানেই শহরটার দোষ একথা বলা বোকামি। সেই রাত্রে তাঁর বাড়িতে এসে কী ঠাট্টাটাই না করে গেলেন গুপ্ত। সুর্মাকে ডেকে বললেন, শোন, তোর বাবার চোখ ভালো করে দেখানো দরকার। সব সময় সর্ষের মধ্যে ভূত দেখছেন। এই রাত্রে আমাকে খামোকা ছোটাল—কাজল বললেন, ওর তো ওই রকম স্বভাব দাদা!

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, জিনিসটা কী ছিল?

কলাগাছ। এই শীতের মধ্যে বোট নিয়ে কাছে গিয়ে যখন গাছটাকে দেখলাম তখন তোমাকে—। মুখ বিকৃত করলেন গুপ্ত।

হঠাৎ সুর্মা বলে উঠল, কিন্তু লেকের চারপাশে কোথাও তো কলাগাছ নেই। ওখানে কী করে গেল?

গেল তো দেখছি।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটির কোনও খোঁজ পাওয়া গেল? পুরো একটা দিন তো কেটে গেল।

গুপ্ত চোখ কুঁচকে বললেন, না, পাওয়া যায়নি। আর যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ কোনও সিদ্ধান্তে আসতে আমি রাজি নই! বাই দি বাই লেকের দুজন প্রহরীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কেন?

তুমি লেকের বাঁধে ঘুরে বেড়ালে অথচ কেউ তোমাকে দেখতে পেল না। ওরা কী জন্যে চাকরি করছে? কলাগাছটাই বা কী করে ওখানে গেল? লোক দুটোকে ওদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুপ্ত আর দাঁড়াননি। ওঁর চলে যাওয়ার পর অপরেশ নিজের মেয়ের চোখেও সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলেন। এখানে আসা অবধি গুপ্ত যেন অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। ওঁর কথাবার্তাগুলো থেকে কোনও বিশ্বাস জন্মায়নি ওঁদের মধ্যে। তবে একটা কথা, অপরেশ বুঝতে পারছিলেন সেই মেয়েটিকে আর কোনও দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই শহরের নামের গায়ে একটু ময়লা লাগুক তা চাইবেন না গুপ্ত। এ ব্যাপারে ভীষণ স্পর্শকাতর তিনি।

বাড়ি ফেরার মুখে পিওনকে দেখতে পেলেন অপরেশ। ছেলেটি ওঁকে খামটা দিল। লম্বা খামটার কোণে ছাপানো ঠিকানা দেখে তাঁর আর তর সইছিল না। তিনি চারপাশে তাকালেন। সামনেই একটা গাছের গায়ে ঝোলানো বোর্ড নজরে এল—'এই শহর আপনার, একে যত্ন করুন।' রাস্তায় এখন বেশ লোকজন। যাঁরা তাকে চেনেন তাঁরা নমস্কার জানিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই তিনি এই শহরে বেশ পরিচিত হয়ে গেছেন।

ধৈর্য রাখতে পারলেন না। খামের মুখটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলেন অপরেশ। দুটো রিপোর্ট। রিপোর্ট নম্বর ওয়ানে কোনও কমপ্লেন নেই! সবকিছুই নিল। অপরেশের মনে আছে এইটে হল লেকের জল। দ্বিতীয়টির দিকে নজর দিলেন তিনি। এবং তৎক্ষণাৎ চমকে উঠলেন। এ কী! এ মারাত্মক বিষ! এখন অবশ্য খুবই সামান্য হারে রয়েছে কিন্তু আর একটু বাড়লেই। অপরেশের মাথা ঘুরতে লাগল।

সেই মুদির দোকান থেকে বোতল দিয়ে ফ্যাক্টরির নিচে থেকে যে জল নিয়েছিলেন এটি সেই জলেরই রিপোর্ট।

অর্থাৎ লেকের জল ভালো আছে কিন্তু সেটা শহরে ঢোকার সময় বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে? তাহলে কি মাটির তলায় পোঁতা জলের পাইপগুলো ফেটেছে এবং সেখান দিয়ে বাইরের কিছু জলে মিশছে? কী মিশছে? যে পদার্থটির কথা রিপোর্টে পাওয়া গেছে তা জলে মিশবে কী করে? এ সব প্রশ্নের উত্তর এখনই মাথায় না ঢুকলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওই পাইপে কিছু গোলমাল হয়েছে। এখন হয়তো খুব সামান্য পরিমাণে লিক করেছে আর ওই বিষ খুব অল্পই জলে মিশতে পারছে, কিন্তু ধীরে-ধীরে যখন পাইপের ফাটলের মুখ বাড়বে তখন একদিনেই শহরের মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

উত্তেজনায় অপরেশের ব্লাডপ্রেশার বেড়ে গেল। তাঁর মনে হল এখনই এই খবরটা সবাইকে জানানো দরকার। প্রায় দৌড়েই বাড়ি চলে এলেন তিনি। সুর্মা আর সুব্রত বাগানে

বসে ছিল। ওঁর মুখচোখ দেখে সুর্মা এগিয়ে এল—কী হয়েছে বাবা?

কী হয়েছে? শুনলে শিউরে উঠবি। এই শহরের জল সম্পর্কে তোর কী ধারণা?

তোমার কী ধারণা সুব্রত? অপরেশের গলায় কাঁপুনি।

কেন? ভালো জল, ফিল্টার্ড ওয়াটার।

দ্রুত মাথা নাড়লেন অপরেশ—নো, নো, ফিল্টার্ড ওয়াটারের নামে আমরা জীবাণু ভর্তি জল খাচ্ছি।

সুর্মা চমকে উঠল—আমাদের খাবার জলে জীবাণু! কী বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি।

সুব্রত বলল, আপনি এত বড় অভিযোগ আনছেন, আপনার হাতে তার কোনও অকাট্য প্রমাণ আছে? আমি তো ভাবতেই পারছি না। এই শহরের জলের এত সুনাম!

এতদিন হাতে প্রমাণ ছিল না বলেই চুপ করে থেকেছি। অনেক দিন থেকে সন্দেহ হচ্ছিল, হঠাৎ এত গ্যাস্ট্রিক অ্যাটাকড পেশেন্ট আসছে কেন? এবং যারা আসছে তারাই ট্যুরিস্ট। অর্থাৎ এই শহরের অরিজিন্যাল মানুষেরা ওই সামান্য জীবাণুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ট্যুরিস্টরা এসেই অ্যাটাকড হচ্ছে। সন্দেহ করেছি কিন্তু বলতে পারিনি। কিন্তু এখন আমার হাতে অব্যর্থ প্রমাণ আছে। অপরেশের মুখ এখন আত্মবিশ্বাসে উদ্ভাসিত।

কী প্রমাণ বাবা? সুর্মা জিজ্ঞাসা করল।

এই যে। কলকাতায় জল পাঠিয়েছিলাম। লেকের জল আর কলের জল। ওখানকার ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল এনালিসিস করে ওরা এই রিপোর্ট পাঠিয়েছে! লেকের জল স্বাভাবিক কিন্তু কলের জলে অর্গানিক ম্যাটার পাওয়া গিয়েছে। ইট ইজ ডেঞ্জারাসলি ইনজুরিয়াস টু হেল্‌থ।

সুর্মার মুখ হাঁ হয়ে গেল। সুব্রত কিছু বলার আগে কাজলের গলা পাওয়া গেল। কখন যেন উনি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এঁরা কেউ লক্ষ করেননি। কাজল বললেন, ভগবান বাঁচিয়েছেন, ভাগ্যিস তুমি ধরতে পেরেছ।

সুর্মা জিজ্ঞাসা করল, এখন কী করবে বাবা?

অপরেশ মাথা নাড়লেন—সব পালটে দিতে হবে, জলের সব ব্যবস্থা বদলে দিতে হবে, পাইপ পালটাতে হবে আর ওই কারখানাটাকে ওই জায়গা থেকে তুলে দিতে হবে।

কোন কারখানা? কাজল প্রশ্ন করলেন।

তোমার জামাইবাবুর চামড়ার কারখানা। ওরই পচা জল পাইপে ঢুকছে। সুব্রত এবার উত্তেজিত হল—আপনি সিওর?

হ্যাঁ।

ওটা তো এমনিতেই বেআইনিভাবে তৈরি, শুধু—

সুব্রত! তুমি থেমে গেলে কেন? দাশগুপ্ত আমার আত্মীয় বলে? না হে, যে নিজের স্বার্থ মেটাতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করছে তাকে আমি কখনই আত্মীয় বলে মনে করি না। অপরেশ দৃঢ় গলায় বললেন।

সুব্রত নিচু গলায় বলল, কিন্তু পাল্টে দেওয়া কি সম্ভব?

অপরেশ বললেন, আলবত সম্ভব। নতুন করে সব করতে হবে আমাদের। এই জলের ব্যবহার এখুনি বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

কাজল চমকে উঠলেন, ও মা! জল বন্ধ করে দিলে আমাদের চলবে কী করে? এত মানুষ জল ছাড়া বাঁচতে পারে?

ধমক দিলেন অপরেশ, জলের বদলে বিষ খাচ্ছ সে হুঁশ নেই?

এই সময় এক ঝরঝরে গাড়ি বিকট শব্দ করতে-করতে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। এই শহরের সমস্ত মানুষ শব্দটিকে চেনে। শহরের একমাত্র খবরের কাগজের মালিক সমাজপতি এটির মালিক। গুপ্ত অনেকবার বলেছেন গাড়িটিকে বাতিল করতে কিন্তু সমাজপতির নাকি দারুণ মায়া জন্মে গেছে গাড়ির ওপরে। ভিনটেজ কার হিসেবে লোকে এটিকে দেখছে এখন।

সমাজপতির চেহারা বেশ মোটাসোটা, গাড়িতে উঠলে একটা দিক সামান্য বসে যায়। মুখে সর্বদা অমায়িক হাসি। ওঁর আবার প্রচুর অর্থ ছিল। তাই স্বচ্ছন্দে এমন কাগজ করছেন যে ট্যুরিস্ট না থাকলে ছাপার খরচ ওঠে না। গেট খুলে এঁদের দেখে তিনি অমায়িক হাসি হাসলেন, হেসে নমস্কার করলেন।

ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য ভালো আছে?

অপরেশ মাথা নাড়লেন। সমাজপতিকে দেখেই ওঁর মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে। সমাজপতি এগিয়ে এসে সুর্মাকে বললেন, তোমার স্কুল চলছে কেমন মা? সুর্মা মাথা নাড়ল, ভালো। সমাজপতি এবার সুব্রতর দিকে ফিরতেই সে হেসে বলল, আমি ভালো আছি।

সমাজপতি এবার অপরেশের দিকে তাকালেন। ডাক্তারবাবু, আমার আসার একটি গূঢ় কারণ আছে। আপনার সঙ্গে একটু নিভৃত আলোচনা করব।

অপরেশ বললেন, কী ব্যাপারে?

এই আমার কাগজের ব্যাপারেই।

অপরেশের মাথায় তখন এ সব ঢোকাতে ইচ্ছে ছিল না। তবু বিব্রত চোখে তিনি মেয়ের দিকে তাকাতেই সুর্মা বলল, তোমরা এখানেই বোসো, আমি চা দিই?

সুব্রত বলল, আমি চলি।

অপরেশের ইচ্ছে ছিল না সুব্রত এখনই চলে যাক। ওর সঙ্গে একটু আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। তিনি বললেন, এখনই?

হ্যাঁ! গুপ্তসাহেব আমাকে ক্লাবে দেখা করতে বলেছেন।

ও। ঠিক আছে।

সুব্রত চলে গেলে সমাজপতি বললেন, ছেলেটি বড় ভালো। অপরেশ হাসলেন, হ্যাঁ খুব সিনসিয়ার।

আপনার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু চমৎকার মানাবে। দিন-টিন ঠিক হল?

অপরেশের মুখে রক্ত জমল। সুব্রত এখানে আসে, বাড়ির সবায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, কিন্তু চিন্তা করার সময় তিনি পাননি। তিনি খুব গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কী কথা বলতে এসেছেন?

সমাজপতি সচেতন হলেন। বললেন, কাগজের বিক্রিটা বাড়ানো দরকার। শুনলাম, হাসপাতালে নাকি ট্যুরিস্টরা পেটের অসুখের জন্যে আসছে। আপনি যদি পেটের অসুখের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখেন তাহলে ভালো হয়। কী-কী ওষুধ খাওয়া দরকার, কী সতর্কতা নেওয়া উচিত, এই আর কী!

এ সব লোকে পড়বে? অপরেশ ভেতরে-ভেতরে খুব উত্তেজিত হলেন।

পড়বে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার নিজের শরীরকে। সেটার যদি গোলমাল হয় তাহলে তার জন্যে যে সব কিছু করতে পারে। আর এ তো পেট নিয়ে কথা। বিশেষজ্ঞর ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন সমাজপতি। অপরেশ মাথা নাড়লেন—লিখব। এমন লেখা লিখব যে সবাই চমকে যাবে।

হ্যাঁ! রোগ হলে সারানো নয়, রোগ যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা। সমাজপতি মাথা নাড়লেন—না, না! রোগ না হলে কেউ ওষুধের কথা শুনতে চায় না।

আপনি বুঝতে পারছেন না—অপরেশ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি একটা আলোড়ন তোলা লেখা চান তো? পাবেন। তবে এখন নয়, কাল দুপুর পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠিক আছে। পরশু সকালের কাগজে বেরিয়ে যাবে আপনার লেখা। সমাজপতি কথা শেষ করে বিদায় নিতে যাবেন এমন সময় গেটে আর-একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে গুপ্ত ওঁদের একসঙ্গে দেখে চোখ ছোট করলেন। গেট খুলে ভেতরে এসে গুপ্ত চাপা গর্জন করলেন, কী আরম্ভ করেছ সমাজপতি?

সমাজপতি নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন—কিছু করিনি তো!

করোনি? আজকের কাগজে হেডিং কী? অ্যাঁ?

অপরেশের মনে পড়ল। ট্যুরিস্ট মেয়েটি কোথায় গেল? প্রশাসন জবাব দাও। এইরকম হেডিং ছিল। গুপ্ত যে উত্তেজিত হবেন তাতে সন্দেহ কি!

সমাজপতি বললেন, কী করব বলুন। পাবলিক প্রেশার দিচ্ছিল খুব। গুপ্ত গর্জে উঠলেন, এবার আমাদের প্রেশার পড়বে তোমার ওপর! পাবলিক দেখাচ্ছ আমাকে! তোমার কাগজ যাতে না বের হয় তাই ব্যবস্থা হবে। সমাজপতি দুহাত জোড় করলেন—মাপ করবেন স্যার। ও সব করলে ধনেপ্রাণে মারা যাব। আসলে মাঝে-মাঝে এক-একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন না ছাড়লে কাগজটা নেতিয়ে যায়। অবশ্য মেয়েটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না—

পাওয়া যাচ্ছে না তো আমি কী করব। কেউ যদি জেনেশুনে গা ঢাকা দেয় ভগবানও তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

কিন্তু আপনি যে আমাকে শাসালেন স্যার, এটা কি ভালো হল? সংবাদপত্রে স্বাধীনতা হরণ করার চার্জে পড়ে যেতে পারেন। গণতন্ত্র বিপন্ন বলে প্রচার করলে এখানে ট্যুরিস্টরা আসবে?

যেন চোখের সামনে ভূত দেখছেন গুপ্ত এমন ভঙ্গিতে সমাজপতিকে দেখলেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ থেকে কোনও শব্দ বের হল না। তারপর খুব চেষ্টাকৃত শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাগজের এখন সারকুলেশন কত?

বিশ হাজার।

এই শহরে পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষিত মানুষ নেই। খবরটা যথাস্থানে জানাতে হবে, যাতে নিউজপ্রিন্টটা ঠিকমতো পাও। গুপ্ত আর কথা না বাড়িয়ে ভাইয়ের কাছে চলে এলেন—তোমার সঙ্গে কথা আছে। চলো, ঘরে বসি।

সমাজপতি ততক্ষণে করজোড়ে গুপ্তর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, স্যার, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতটা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আলোচনা করতে গেলে তো নানান কথা ওঠে, সবই কি মনে রাখা উচিত!

গুপ্ত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন—উচিত নয়? বেশ, তাহলে কালকের কাগজে হেডিং দিও প্রশাসন যা চেষ্টা করছে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ এত তৎপরতা দেখাত না। বুঝলে?

সরাসরি এই কথাটা না লিখে, একটু উলটে-পালটে—

তাহলে কোনও কিছু সোজা থাকবে না। এবার এসো। গুপ্ত ঘুরে দাঁড়াতেই সমাজপতি পিছু ফিরলেন। মনে-মনে তিনি তখন অবিনাশকে গালাগালি দিচ্ছিলেন। পাবলিক সিমপ্যাথি পাওয়ার জন্যে বাবু জ্বলন্ত হেডিং দিয়েছেন! এখন বোঝ। ঠ্যালা সামলাবার সময় তো আর কাউকে পাওয়া যাবে না। ছোঁড়াটাকে তাড়ানোও যাচ্ছে না। কাগজটার সবকিছু ওই, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ করার মতো লোক আর কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্তাদের চটিয়ে এই শহরে কতদিন থাকা যাবে? কিন্তু না, এই রকম মেরুদণ্ডহীন হয়ে একদল সম্পাদকের বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। কালকের হেডিংটা পালটে দিয়ে শেষবার তিনি আপোস করছেন, আর নয়।

সশব্দে গাড়িটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গুপ্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর ঘরে ঢুকে দেখলেন সুর্মা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকছে—ও মা, জেঠু আপনি কখন এলেন। সমাজপতিবাবু চলে গেছেন?

গেছেন। চা কি ওর জন্যে করেছিলে? গুপ্ত বললেন।

হ্যাঁ, মানে—

তাহলে আমাকে দিয়ে দাও। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সুর্মা হাসল, বাবার সঙ্গে দেখছি আজ সবার কথা আছে।

এতক্ষণে অপরেশ কথা বললেন, ও সমাজপতির কথা বলছে।

সমাজপতির সঙ্গে কী কথা তোমার? গুপ্ত ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ওঁর কাগজে লেখার ব্যাপারে—

কী বিষয়ে?

জনস্বাস্থ্য। অপরেশ চায়ের কাপ তুলে নিলেন। সুর্মা ভেতরে চলে গেল। গুপ্ত মাথা নাড়লেন—জেনারেল আলোচনা করো আপত্তি নেই। কিন্তু এই শহরের মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে তুমি শহরের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও কথা লেখবার আগে একটু ভাববে। হ্যাঁ, যে জন্যে তোমার কাছে এলাম, তোমার চিঠি আজ কমিটি পেয়েছে।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা আলোচনা করেছেন?

হুঁ! কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে প্রথমে কথা বললে না কেন?

আপনি তো কান দিচ্ছিলেন না।

তাই বলে সরাসরি কমিটিকে লিখবে? কমিটি মানে তো আমরাই এবং আমি।

কিন্তু মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে সেটাই আমার কর্তব্য। তাই না?

ও! শোনো, আমরা আলোচনা করে দেখলাম তুমি যা লিখেছ তার কোনও প্রমাণ নেই। তোমার সন্দেহ ট্যুরিস্টদের পেটের অসুখের কারণ এখানকার জল। কিন্তু জল নিয়ে কোনও কমপ্লেন নেই। এই জল আশেপাশে সব শহরের। সেরা ট্যুরিস্টরা এখানে আসে ওই ভালো জলের জন্যেই। তোমার কথা যদি জানাজানি হয়ে যায় তা হলে ট্যুরিস্টরা প্যানিকি হয়ে যাবে। শুধু সন্দেহের বশে এ সব কথা বললে তুমি শহরের ক্ষতি করবে। এই জন্যে তোমাকে আমি এখানে নিয়ে আসিনি। গুপ্ত চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। গুপ্তর কথা চুপচাপ শুনছিলেন অপরেশ। এবার খুব শান্ত গলায় বললেন, না সন্দেহ নয়, নিশ্চিত প্রমাণ আছে আমার হাতে।

কী প্রমাণ? চমকে উঠলেন গুপ্ত। ওঁর কাপের চা চলকে উঠল।

এই শহরের জল জীবাণুযুক্ত। এবং এর পরিমাণ বেড়ে গেলে মহামারী দেখা দেবার আশঙ্কা আছে। স্পষ্ট গলায় বললেন অপরেশ।

কী বলছ! লেক থেকে জল তুলে শোধন করে আমরা পাইপে করে সেই জল শহরে পাঠাই। লেকের জলে যদি জীবাণু থেকেই থাকে তবে তা পরিশোধিত হয়ে যায়। তুমি এতে জীবাণু পেলে কোত্থেকে?

অপরেশ মাথা নাড়লেন—না, লেকের জলে জীবাণু নেই। খুব স্বাভাবিক আর পাঁচটা পাহাড়ি জলের মতনই। কিন্তু পাইপের জলেই জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে।

কী করে বুঝলে?

এই কাগজগুলো দেখুন। আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি ওই জল পরীক্ষার জন্যে কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম। সেখান থেকে আজ রিপোর্ট এসেছে। ওরা বলছে পাইপের জল বিষাক্ত। সগৌরবে হাসলেন অপরেশ। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন গুপ্ত। ক্রমশ ওঁর মুখের পেশি শক্ত হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে বললেন, কোথায় রিপোর্ট?

অপরেশ খামটা বাড়িয়ে দিলেন। গুপ্ত রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে মুখ বিকৃত করলেন— এটা তো ভুলও হতে পারে।

অপরেশ মাথা নাড়লেন, না, নিচে লেখা আছে ওরা ডবল চেক করেছে। রিপোর্টটা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে গুপ্ত বললেন, আমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে জল পরীক্ষা করার জন্যে পাঠাতে কে বলল?

আমার বিবেক।

তুমি কী চাও? গুপ্ত দাঁতে দাঁত রাখলেন।

এই শহরের জল জীবাণুমুক্ত হোক।

আমি মনে করি না জীবাণু আছে। অবশ্য তোমার এই কাগজের লেখা যদি সত্যি হয় তা হলে কীভাবে তা মুক্ত হবে বলে মনে করো?

পুরো ব্যবস্থাটাই পালটাতে হবে। প্রথমে ওই চামড়ার কারখানাটা ওখান থেকে সরানো দরকার। ওই চামড়া ধোওয়া জল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে হয় রিজারভারে পড়ছে, না হয় ফাটা পাইপের জলে মিশছে। দ্বিতীয়ত, এই শহরের জলের পাইপগুলো পালটানো দরকার। এগুলো এখন দূষিত হয়ে গেছে। ব্যস। এই কথাগুলো বলতে পেরে অপরেশ

তৃপ্ত হলেন।

ইউ আর ম্যাড! কমপ্লিটলি ম্যাড!

কেন?

এই শহরের জলের পাইপ পালটানোর কথা বলছ, পাগল না হলে কেউ এ কথা বলে! কত খরচ পড়বে জানো? কনকপুর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন দেউলিয়া হয়ে যাবে। অসম্ভব প্রস্তাব। আর ওই ফ্যাক্টরির জল থেকেই যে এই ব্যাপারটা ঘটছে তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে?

আছে। লেকের জল একরকম আর ঠিক ফ্যাক্টরির নিচের জল অন্য রকম। এ থেকেই বোঝা যায় গোলমালটা ওখান থেকেই হচ্ছে।

তুমি ভুলে যাচ্ছ ফ্যাক্টরিটা কার!

না, মোটেই ভুলছি না। দাশগুপ্ত আমার ভায়রাভাই কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না। যে জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করছে তার কোনও ক্ষমা নেই।

তোমার স্ত্রীও কি একই মত পোষণ করে?

জানি না।

গুপ্ত এবার উঁচুগলায় ডাকলেন, বউমা?

কাজল বোধহয় কাছাকাছি ছিলেন। দুবার ডাকতেই দরজায় এসে দাঁড়ালেন, আমাকে ডাকছেন দাদা?

হ্যাঁ। গুপ্ত মাথা নাড়লেন, তোমার জামাইবাবুর চামড়ার ফ্যাক্টরিটা এখান থেকে তুলে দিলে তুমি কি খুশি হবে?

ওমা! সে কি কথা! দিদির এত বড় সর্বনাশ করবেন কেন?

আমি করছি না, করছে তোমার স্বামী।

মানে? কাজল স্বামীর দিকে তাকালেন।

অপরেশ বললেন, তোমার জামাইবাবুর ফ্যাক্টরির জন্যে এই শহরের মানুষের জীবন বিপন্ন। চামড়া ধোওয়া জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশে বিষাক্ত করছে। তা ছাড়া, ওই ফ্যাক্টরিটা বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে।

কে বলল? গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

সুব্রত।

হুম। সে ছোঁড়াও পেছনে লেগেছে দেখছি। গুপ্ত স্বগতোক্তি করলেন।

না দাদা, কেউ পিছনে লাগেনি। তুমি এই শহরটাকে গড়েছ, একে সন্তানের মতো ভালোবাস, আমি জানি। তাই একে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে কঠোর হতেই হবে। অপরেশ পরম আবেগে কথাগুলো বললেন।

কাজল বললেন, ফ্যাক্টরিটা না তুলে দিয়ে কিছু করা যায় না?

না, ওটাই সব কিছুর মূলে।

কাজল জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?

হচ্ছি কারণ তার প্রমাণ আছে।

আমার ভালো লাগছে না। জামাইবাবু একেই তোমাকে পছন্দ করেন না, তারপর যদি শোনেন তমি এ সব কথা বলছ তা হলে—। তুমি তো দাদাকে সব বললে, এবার

যা ভালো হয় দাদাই সব করবেন, তোমার আর মাথা ঘামানোর কী দরকার! অপরেশের কাছে দাঁড়ালেন কাজল।

তা তো নিশ্চয়ই। দাদা যদি কোনও ব্যবস্থা নেন তাহলে তো সব মিটেই গেল।

অপরেশ গুপ্তর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

এতক্ষণ গুপ্ত স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ শুনছিলেন। এবার খুব ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন, এই ব্যাপারটা আর কে-কে জানে?

আমাদের পরিবারের বাইরে কেউ নয়। আর হ্যাঁ, সুব্রত জেনেছে।

বাঃ! চমৎকার। তা শুনছি সুব্রত নাকি তোমার পরিবারের একজন হয়ে পড়েছে। তুমি কি জানো ওর বাবা পাগল ছিল?

পাগল। কাজল চমকে উঠলেন—কই জানি না তো!

জানবে কী করে? তোমরা তো অ্যাদ্দিন বাইরে-বাইরে ঘুরেছ। যা করবে বুঝে-সুঝে করো। সুব্রত ছোঁড়াটার সঙ্গে মেয়েকে বেশি মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত হচ্ছে না। এমনিতেই শহরে এ নিয়ে নানান কথাবার্তা চলছে। গুপ্ত উঠলেন।

অপরেশ বললেন, দাদা, সুব্রত এ বাড়িতে আসে, ভালো ব্যবহার করে। ওকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। এ ছাড়া অন্য সম্পর্ক তৈরি করার কথা আমার মাথায় কখনও আসেনি। তবে সুর্মা যদি ওকে নির্বাচন করে তাহলে আমার আপত্তি নেই।

ওর বাবার খবরটা শোনার পরও এ কথা বলছ?

হ্যাঁ। কারণ আমি ওর মধ্যে কোনওরকম অসুস্থতা দেখছি না।

কাজল বলল, কথাটা বলে আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন দাদা। আমাদের একটু খোঁজখবর নিতে হবে এ ব্যাপারে।

'অপরেশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এই সব আলোচনা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহালে দাদা, আপনি, আপনারা কি আমার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেন?

কী বিষয়ে? গুপ্ত খুব সহজ গলায় শুধোলেন।

অপরেশ এক মুহূর্ত চুপ করে দাদাকে দেখলেন। তারপর নিজেকে সংযত করে জবাব দিলেন, জলের ব্যাপারে?

গুপ্ত বললেন, শোনো—তোমার কর্তব্য হল হাসপাতালে যেসব মানুষ অসুস্থ হয়ে আসবে তাদের সেবা করা, সারিয়ে তোলা। এর বাইরে কোথায় কী হচ্ছে তা জানার কোনও দরকার নেই।

অপরেশের মেজাজ গরম হয়ে গেল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন দাদা আমি শহরের মেডিকেল অফিসার। এই পদের জোরে আমি ওই বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারি। কারণ তাতে জনস্বাস্থ্য জড়িয়ে আছে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন গুপ্ত। তারপর কাজলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বউমা, তোমার স্বামীকে সাবধান করে দাও। এই মুহূর্তে শহরের জলের পাইপ আর কারখানা পালটাতে হলে আমরা শেষ হয়ে যাব। আমার রক্ত জল করে গড়া শহরটায় আর কখনও ট্যুরিস্ট আসবে না। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। ও অযথা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে যদি বাড়াবাড়ি করে তা হলে আমি ছেড়ে

কথা বলব না।

গুপ্ত আর দাঁড়ালেন না। একটু বাদেই তাঁর গাড়ির আওয়াজ উঠল রাস্তায়। অপরেশ দু হাতে মাথা চেপে চেয়ারে বসে পড়লেন। কাজল নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ালেন—শোনো!

অপরেশ মুখ তুললেন না।

কেন মিছে অশান্তি ডেকে আনছ?

অপরেশ মুখ তুললেন—অর্থাৎ?

সারাজীবন তো ওই একগুঁয়ে মনের জন্যে কষ্ট পেলে। আজ যখন একটু স্বাচ্ছন্দে আছি তখন খামোকা গোলমালে যাওয়ার কী দরকার?

অপরেশ চিৎকার করে উঠলেন, চমৎকার! বিষ খেয়ে সমস্ত শহরে মানুষ আগামীকাল ছটফট করবে জেনেও আজ আমি চুপ করে বসে থাকব? আমি বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে শিখেছি। না, না। অন্যায়ের সঙ্গে আমি আপোস করতে পারব না।

কিন্তু তুমি একা কী করবে? দাদার কত ক্ষমতা জানো? তা ছাড়া, আর কেউ যখন এগিয়ে আসছে না তখন তোমার মাথাব্যথা কেন?

আর কেউ জানে না তাই এগিয়ে আসছে না। সবাইকে জানাতে হবে। মানুষ যখন বুঝবে ওই জল থেকে তার আশু সর্বনাশ, তখন সবাই এগিয়ে আসবে। না, তুমি আমাকে বাধা দিও না।

কাজলকে অবাক করে অপরেশ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আচমকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পেছন থেকে কাজল চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

অপরেশ উত্তর দিলেন, ভয় পেও না। এমন কিছু আমি করব না, যাতে তোমার কোনও ক্ষতি হয়। রাত হবে ফিরতে।

এরই মধ্যে পাহাড়ে বেশ অন্ধকার নেমেছে। হুহু করে কনকনে ঠান্ডা বইছে। না বাতাস নেই, শুধু ঠান্ডার ঢেউ যেন। অপরেশের একটু কাঁপুনি এল কিন্তু তিনি জোরে হাঁটতে লাগলেন। একটু জোরে হাঁটলেই শরীর গরম হয়ে যায়।

রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। ঠান্ডা বাড়লেই আর কেউ বাইরে থাকে না। অপরেশ ভাবছিলেন, দাদা ওকে শাসিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, তাঁর পরিবার দাদার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি নন। তিনি তো বেশ ভালোই ছিলেন পুরুলিয়ায়। হয়তো দুবেলা ভাত জুটত না কিন্তু গ্রামে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। এই শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দে তাঁর কোনও লোভ নেই। তিনি যতক্ষণ মানুষ ততক্ষণ অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যাবেন।

বাঁক পেরিয়ে পা ফেলতেই হঠাৎ তাঁর কানে একটা কাতরানি এল। কেউ যেন ককিয়ে-ককিয়ে গোঙাচ্ছে। জায়গাটায় রাস্তার আলো কম। শব্দটা লক্ষ করে চারপাশে তাকাতে লাগলেন অপরেশ। কোনও প্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও। শব্দটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে কান পাতলেন তিনি। তারপর সেটা লক্ষ করে পায়ে-পায়ে এগোলেন। ডানদিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ট্যুরিস্টদের বসবার জন্যে একটা সিমেন্টের বেঞ্চি করা আছে। শব্দটা আসছে তার তলা থেকে। ঝুঁকে পড়ে তিনি লোকটাকে দেখতে পেলেন।

বেঞ্চির তলায় লোকটা কুঁকড়ে শুয়ে-শুয়ে কোঁকাচ্ছে। অপরেশ ডাকলেন, এই তুমি কে? কী হয়েছে?

সঙ্গে-সঙ্গে শব্দটা আরও বেড়ে গেল। অপরেশ এবার ভালো করে লক্ষ করলেন। না, পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা ভিখিরি নয়। জুতো-মোজা পরা, প্যান্টটিও অক্ষত। পরনে সোয়েটার আছে। অপরেশ এবার যেন জোরে ধমকে উঠলেন, অ্যাই চুপ করো! কী হয়েছে তোমার?

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা নির্বাক হয়ে গেল। গলা থেকে শব্দ বের হচ্ছে না। মুখ ঢেকেই প্রশ্ন করল, কে বাবা তুমি—ঈশ্বর?

অপরেশের এই ঠান্ডাতেও হাসি পেল—না, ডাক্তার।

ও, তা দুটো একই কথা।

কী হয়েছে?

ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছি। এত কষ্ট আগে কোনও দিন পাইনি মাইরি।

তা এখানে কী করছ? বাড়িতে যাও।

কী জ্ঞান দিচ্ছ বাবা। আরে সেটা পারলে তো চলেই যেতাম।

কী হয়েছে তোমার?

হাঁটতে পারছি না। কোমর থেকে পা জমে গেছে।

এবার অপরেশের নাকে ভকভক করে মদের গন্ধ এল। লোকটা মদ খেয়ে এখানে পড়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে মন বিরূপ হয়ে উঠল! কোনও কথা না বলে অপরেশ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এই লোকটার ওপর কোনও সহানুভূতি দেখানোর মানে হয় না।

অপরেশ পা ফেলে এগিয়ে যেতেই লোকটা আবার কোঁকাতে লাগল—যাবেন না, চলে যাবেন না, আমাকে বাঁচান।

অপরেশ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, মদ খেয়ে নেশা করেছ, লজ্জা করে না!

করছে। মাইরি জীবনে কখনও আউট হইনি আর শেষপর্যন্ত আজই হলাম। কী লজ্জা! তা ঈশ্বর, তুমি আমাকে ফেলে যেও না মাইরি। মিনতি করতে লাগল লোকটা। অপরেশ একটু ভাবতে গিয়েই দুর্বল হয়ে পড়লেন। তিনি আবার পিছিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দিকে যাবে? আমি সামনের দিকে এগোচ্ছি।

আমিও পেছন দিকে এগোব না। আমার হাত ধরো ঈশ্বর!

লোকটা বেঞ্চির তলা থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল। অগত্যা অপরেশ হাত ধরলেন। লোকটা গুঁড়ি মেরে বেঞ্চির তলা থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে এসে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, আমার পাদুটো ঠিক আছে?

ঠিক থাকবে না কেন?

কী জানি। মনে হচ্ছিল নেই, তাই বললাম। শালা এই মনটাই সবচেয়ে বেইমান। এটাকে অপারেশন করে বাদ দেওয়া যায় না, ঈশ্বর?

অপরেশের আবার হাসি পেল। এরকম প্রশ্নের সামনে তিনি কখনও পড়েননি। তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, আমার কাঁধে হাত রেখে তুমি হাঁটতে পারবে?

লোকটার পা টলছিল। শরীর রীতিমতো ঠান্ডা। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। কয়েক পা এগিয়েই অপরেশের হাঁফ ধরে গেল। একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওই বেঞ্চির তলায় ঢুকেছিলে কী করতে?

লোকটা এবার হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। অপরেশ এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। হকচকিয়ে গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল?

কান্না থামতে লোকটা বলল, সেইটেই তো লজ্জা। বেশ যাচ্ছিলাম পথ দিয়ে। হঠাৎ ওইখানটায় এসে আছাড় খেলাম। মাইরি, জীবনে প্রথম। পড়ে মনে হল আমি নেই। অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম আছি। কিন্তু কোমর থেকে পা পর্যন্ত নেই। আর পা না থাকলে আমি হাঁটব কী করে? চিৎকার করলে লোকে টের পেয়ে যাবে, পাঁচজনে ছ্যা-ছ্যা করবে। ওই সময় বেঞ্চিটা নজরে এল। গড়িয়ে-গড়িয়ে ওর তলায় চলে গেলাম। ভাবলাম পা ফিরে এলে কেটে পড়ব। মাইরি, কী বলব? মাথার ওপর বেঞ্চির ছাদ, তবু শালা এত কনকনে ঠান্ডা যে বাপের নাম খগেন হয়ে গেল। কিন্তু পা নেই যার, তার কী করার আছে! এই সময় তুমি এলে।

অপরেশের মনে হল লোকটার মন সরল। তিনি সস্নেহে বললেন, ও সব ছাইপাঁশ খাও কেন?

লোকটা সজোরে মাথা নাড়ল—যাঃ শালা! আবার জ্ঞান! আরে আমি যদি না খেতাম তাহলে কি তোমার দেখা পেতাম, ঈশ্বর?

চৌমাথায় এসে নিষ্কৃতি পেলেন অপরেশ। একটা দোকানের সামনে লোকটা নিজে থেকেই চলে গেল। অপরেশের মনে হল লোকটা মদ খাওয়ার নাম করে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছে। আমি নেশা করেছি এই বোধ ওকে হয়তো অনেক কিছু থেকে আড়াল করে দূরে সরিয়ে রাখে।

হাসি পেল অপরেশের, আচ্ছা দাদারও কি একই অবস্থা নয়? শহরটাকে আমি তৈরি করেছি, ভালোবাসি, এই নেশা তাঁকে বাস্তব বোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে নাকি?

সমাজপতির অফিসে আলো জ্বলছিল, কিন্তু সমাজপতি নেই। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অপরেশ দেখলেন অবিনাশ টেবিলে উপুড় হয়ে প্রুফ দেখছে। পায়ের শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলতেই অবাক হল। তড়িঘড়ি উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, আরে, আপনি হঠাৎ? কী ব্যাপার?

সমাজপতি কোথায়?

ঘুমুচ্ছেন।

ঘুমুচ্ছেন! এই সন্ধেবেলায়? দেওয়াল ঘড়িতে তখন আটটা বাজে।

ফার্স্ট রাত্রে উনি লাস্ট রাত্রে আমি, এই নিয়ম।

ডাকো ওঁকে। চেয়ার টেনে বসলেন অপরেশ।

অসম্ভব। এখন ডাকা নিষেধ আছে।

কিন্তু আমার যে জরুরি দরকার ছিল!

কী ব্যাপারে বলুন? ওঁর ঘুমের সময়ে যে-কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। জেগে থাকলে নেই।

অবিনাশ নিজের টেবিল-চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসে বেল বাজাল। একটি ছোকরা ঢুকতেই সে প্রুফগুলো তাকে ধরিয়ে দিয়ে হুকুম করল, ছাপা শুরু হবে আধঘণ্টার মধ্যে, ওদের বলে দাও।

ছোকরা চলে গেলে অপরেশ বলল, অবিনাশ, আমার কাছে এমন তথ্য আছে যা ছাপা অত্যন্ত জরুরি।

ঘাড় নাড়ল অবিনাশ, ওই ওষুধের ব্যাপারে তো? ওটা অবশ্য এমন কিছু জরুরি নয়। আমার তো ওষুধ খেতে একদম ভালো লাগে না।

মাথা নাড়লেন অপরেশ, ওষুধ নয়। এই শহরকে বাঁচাতে হবে। তোমরা জানো না কী ভীষণ বিপদের মুখে এই শহর দাঁড়িয়ে। এইভাবে যদি চলে তাহলে আগামী এক বছরের মধ্যে এই শহরের প্রতিটি মানুষ রোগে আক্রান্ত হবে এবং একবার আক্রান্ত হলে শেষ হয়ে যাবে শহরটা।

সোজা হয়ে বসল অবিনাশ—কী বলছেন আপনি!

ঠিকই বলছি। আমি সমস্ত ব্যাপারটা তোমাদের কাগজে ছাপাতে চাই।

উত্তেজনা এসে ভর করল অবিনাশকে। চট করে সে তার ডায়েরি আর কলম টেনে নিল—বলুন, বলুন, আমি এক্ষুনি লিখে নিচ্ছি।

তুমি লিখবে? আমি ভাবলাম নিজেই বিস্তারিত লিখব। অপরেশ আড়ষ্ট বোধ করলেন। ডিক্টেশন দেওয়ার জন্যে তিনি ঠিক তৈরি ছিলেন না। অবিনাশ বলল, তা হলে তো কালকের কাগজে ছাপা যাবে না। আমার পেজ মেকাপ হয়ে গেছে বললেই হয়। ঠিক হ্যায়, সর্বনাশা খবর বলে অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। পরশুদিন তাহলে মারকাটারি সেল হবে। আগে থেকে বাজার গরম করে রাখা ভালো। কিন্তু খবরটা কী বলুন তো?

অপরেশ হাসলেন, আমাকে তুমি একটা কাগজ আর কলম দাও।

দেড়ঘণ্টা লাগল লেখাটা তৈরি করতে। সমস্ত ঘটনা স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন অপরেশ। কিন্তু লেখাটার হেডিং তৈরি করতে গিয়ে বিপদে পড়লেন। কোনও শব্দই তাঁর পছন্দ হয় না। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, নাও, এটা পড়ে ভালো হেডিং দিয়ে দাও। ওটা আমার আসছে না।

এতক্ষণ নিজের চেয়ারে বসে জুলজুল করে তাকিয়ে ছিল অবিনাশ। এবার এক ফাঁকে কাছে এসে লেখাটাকে তুলে নিল, নিয়ে বলল, ইস, আপনাদের মানে ডাক্তারদের, হাতের লেখা খুব খারাপ হয়। বলে পড়তে লাগল লেখাটা। পড়া শেষ করে চিৎকার করে উঠল, আই বাপ! এ সব কী লিখেছেন ডাক্তারবাবু? এগুলো সব সত্যি কথা?

হ্যাঁ, সূর্য-চন্দ্রের মতো সত্যি।

ওই কলের জলে বিষ আছে আর আমরা সবাই নিশ্চিন্তে তাই খাচ্ছি? তাই কদিন থেকে আমার পেটটা কেমন লুজ হচ্ছিল।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করল, হেডিংটা কী হবে?

দাঁড়ান, দাঁড়ান! ওঃ, এ লেখা তো একটা আগ্নেয়গিরি। চারধারে যা হইচই পড়ে যাবে না! হ্যাঁ, প্রতিষেধক হল চটপট জলের লাইন পালটাও আর ওই চামড়ার

ফ্যাক্টরি সরাও। ওহো, এই লেখার সঙ্গে আমার তোলা সেই ফ্যাক্টরির ছবিটা ছেপে দেব। ক্যাপশন দেব—বিষ সরবরাহ কেন্দ্র। এই শহরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যা ধাক্কা খাবে না! অবিনাশের বোধ হয় নাচতে ইচ্ছে করছিল। লেখাটা নিয়ে সে ছটফট করছিল। তারপর হঠাৎ কথাটা মনে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এই সব তথ্যের যথার্থতার প্রমাণ আছে?

আছে, আমি তো লিখেছি কলকাতা থেকে জল পরীক্ষা করে এনেছি। কথাটা বলতে গিয়ে অপরেশের অস্বস্তি হল। ওঁর মনে পড়ল একটু আগে গুপ্ত রিপোর্টটা পড়ে নিজের পকেটে নিয়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ এই মুহূর্তে কোনও প্রমাণ তাঁর হাতে নেই। সঙ্গে-সঙ্গে কথাটাকে নিজেই বাতিল করলেন। —এই জল যে-কোনও সময়ে কলকাতায় পাঠালে ওই একই রিপোর্ট আসবে। অতএব প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

অবিনাশ বলল, কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনার নামে এই লেখা ছাপলে আপনার দাদা খুব রেগে যাবেন। হয়তো আপনার বিপদ হবে।

অপরেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, দেখো অবিনাশ, পৃথিবীতে জন্মাবার পর অনেক বিপদ পার হয়ে এলাম। আর ও সবের ভয় করি না। এই শহরের মানুষ যদি এই লেখা ছাপানোর ফলে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে তাহলেই আমি খুশি হব। আমার একার কষ্টের জন্যে হাজার মানুষের জীবন বিপদগ্রস্ত জেনেও নির্বাক হয়ে থাকব? এত বড় কাপুরুষ আমি? তা হলে আর মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?

অবিনাশ এতখানি আপ্লুত হয়ে পড়েছিল যে এগিয়ে এসে সে অপরেশকে প্রণাম করল, সত্যি ডাক্তারবাবু, আপনার মতো মানুষ আমি এর আগে কখনও দেখিনি!

অপরেশ হাসলেন, তা এই লেখা ছাপলে তোমাদের কাগজের কোনও অসুবিধে হবে না তো?

হোক, তবু ছাপাতে হবে। সংবাদপত্র যদি তার চরিত্র হারায় তাহলে—অপরেশ বাধা দিলেন, মনে রেখো, আমি যেমন এই শহরকে বাঁচাতে চাই, মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে-খেলা বন্ধ করতে চাই, ওই লেখা ছাপিয়ে তোমরা সেই একই কাজ করতে চলেছ। হেডিংটা কী দেবে?

অবিনাশ চটপট জবাব দিল, মৃত্যুর মুখোমুখি কনকপুর, জল বিষাক্ত। কেমন মনে হচ্ছে? লোকে নেবে?

অপরেশ মাথা নাড়লেন। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে। অবিনাশ একটা স্লিপে লিখল, 'কনকপুর সম্পর্কে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য আগামীকাল প্রকাশিত হবে। লক্ষ রাখুন।' তারপর স্লিপটা নিয়ে ছুটল প্রেসের দিকে। আগামীকালের কাগজের প্রথম পাতার মাঝখানে এটাকে ছাপতে হবে।

লনে বসে চা খাচ্ছিলেন গুপ্ত। এমন সময় কাগজ এল। কলকাতার কাগজ এখানে আসে একদিন পরে। তার ছাপা এবং খবরের কাছে সমাজপতির কাগজ লিলিপুটের চেয়েও ছোট। কিন্তু তবু সকালবেলায় চায়ের সঙ্গে কাগজ পড়ার অভ্যাসেই এই বদখত ছাপা কাগজটায় চোখ রাখতে হয়। গুপ্ত খুব অবহেলার সঙ্গে কাগজটা টেনে নিয়ে ওপরে নজর দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন। হুম, ব্যাটারা রেডিও থেকে শুনে

ছেপেছে। আর-একটু নিচে নামতেই তাঁর চোখ স্থির হল—'কনকপুর সম্পর্কে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য আগামীকাল প্রকাশিত হবে। লক্ষ রাখুন।' এ আবার কী ধরনের রসিকতা! ভয়ঙ্কর তথ্য! মানেটা কী?

প্রথমে ভাবলেন এটা, সমাজপতির স্টান্ট দেওয়ার চেষ্টা। যাতে কাল লোকে কাগজটা কেনে। আগামীকাল হয়তো থাকবে, বিশ হাজার বছর আগে এখানে কুমির হাঁটত। এই রকম মজা আর কী! কিন্তু তারপরেই মনে হল, অন্য কিছু যদি হয়? কী হতে পারে? সঙ্গে-সঙ্গে ভাইয়ের মুখ মনে পড়ল। গতরাতে ভালো করে ঘুমুতে পারেননি তিনি। মাঝরাতে নিজে অর্ডার লিখে পাঠিয়েছেন। আজ সকালে এতক্ষণে নিশ্চয়ই অপরেশ পেয়ে গেছে। আজ থেকে তাঁকে মেডিক্যাল অফিসারের পথ থেকে বরখাস্ত করা হল। অপরেশ এখন শুধু হসপিটালের ডাক্তারের চাকরিতে থাকবে! শহর নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। এটা প্রথম ওয়ার্নিং। এ থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা পাবে সে। কিন্তু গুপ্তর মনে পড়ল, সমাজপতি কাল বিকেলে অপরেশের কাছে এসেছিল। এই সব তথ্য কি সে সমাজপতিকে দিয়েছে? কালকের কাগজে কি ওই খবরটা ছাপানোর আয়োজন করছে সমাজপতি? ধীরে-ধীরে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল গুপ্তর। যদিও খবরটা সত্যি হয় তবু তা জনসাধারণকে কখনই জানানো যাবে না। না, তিনি কিছুতেই খবরটা ছাপতে দেবেন না। ওটা যদি কাগজে বের হয় তাহলে পরশু দিনই শহরটা ফাঁকা হয়ে যাবে। ভুলেও কেউ আর কনকপুরে পা দেবে না। এই মৃত্যুপুরী নিয়ে তিনি তখন কী করবেন? এইজন্যেই কি তিনি এত বছর ধরে তিল-তিল করে শহরটাকে গড়েছেন? যতই জলের পাইপ পালটাও আর কারখানা সরাও সাধারণ মানুষের মন থেকে সন্দেহ দূর হবে না। তা ছাড়া, এই জলের পাইপ পালটাবার অর্থ তাঁর নেই। কনকপুর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে দাশগুপ্তর যা শেয়ার আছে তাতে ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারখানা সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। দাশগুপ্ত রাজি হবে না। সেটা করতে গেলে অবশ্যই ওঁর কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে যাবে।

না, খবরটাকে বন্ধ করতে হবে। মৃত্যুর মুখোমুখি কনকপুর—! হ্যাঁ এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেল গুপ্তর কাছে। এইটেই যে খবর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন গুপ্ত। এতবড় স্পর্ধা সমাজপতির যে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করল না এটা ছাপার আগে? এই লেখা যে সোজা তাঁর বিরুদ্ধে যাবে এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কিছু নেই। আর তাঁর নিজের ভাই? পুরুলিয়ার গ্রামে না খেয়ে মরছিল, তিনি দয়া দেখিয়ে তাকে তুলে নিয়ে এলেন নিজের সর্বনাশ করার জন্যে? অকৃতজ্ঞ, বেইমানের দল। এই মুহূর্তে দুজনকে তিনি শহর থেকে ছুড়ে দিতে পারেন বাইরে। চাই কী পাহাড়ের কোণে খাদের গভীরে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে পারেন ওই মৃত মেয়েটির মতো।

মেয়েটির কথা মনে আসতেই চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন গুপ্ত। তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না মেয়েটি সত্যি লেকের জলে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু সেই সামান্য খবরটাও তিনি প্রচারিত হতে দেননি। বাঁধের দুই প্রহরীকে দিয়ে মৃতদেহ জল থেকে তুলিয়ে খাদের মধ্যে সমাধি দিয়েছেন। তারপর প্রহরী দুজনকে মোটা বকশিস দিয়ে তাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কেউ আর ওই দেহ খুঁজে পাবে না।

কনকপুরের চরিত্রের ওপর সামান্য আঁচড় পড়ার আর সম্ভাবনা রইল না।

ওটা তো সামান্য ব্যাপার ছিল, তাও তিনি ঝুঁকি নেননি আর এতবড় সর্বনাশ তিনি সহ্য করবেন? এখনি পুলিশ কমিশনার সেনকে ডাকবেন নাকি? একটা ছোট্ট হুকুমে সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সতর্ক করলেন। না, এটা একটা বড় রকমের বোকামি হয়ে যাবে। খবরটা অপরেশের স্ত্রী এবং সম্ভবত মেয়ে জানে। সুব্রত ছোকরাও জেনেছে। ওদিকে সমাজপতির সেই রিপোর্টার ছোঁড়াও নিশ্চয়ই সব জেনে গেছে। অতএব খুব ধীর মাথায় কাজ করতে হবে। কোনওরকম উত্তেজনা নয়। এই শহরটাকে বাঁচাতে প্রতিটি পদক্ষেপ ভেবেচিন্তে নিতে হবে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে গাড়ি নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন গুপ্ত। গেট খুলে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তেই চাকরটা এসে দরজা খুলে দিল। অপরেশ নাকি হাসপাতালে আর সুর্মা স্কুলে। খবর পেয়ে কাজল ছুটে এলেন—দাদা, এ কী হল? ওকে মেডিক্যাল অফিসারের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে! এ কী করলেন দাদা?

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে গুপ্ত বললেন, কী আর এমন হয়েছে তাতে। মাত্র দুশো টাকা মাইনে কমবে এতে।

কাজলের গলার স্বর ভাঙছিল, দাদা, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না।

গুপ্ত আস্তে-আস্তে বললেন, বউমা। আমি তোমাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম। তোমরা যখন না খেয়ে মরছিলে তখন আমি তোমাদের এখানে এনে রাজার হালে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমার স্বামী তার বিনিময়ে কী দিলে আমাকে? সে আমার এই শহরটাকে তছনছ করে দিতে চাইছে। আমি তো আর চুপ করে থাকতে পারি না। যে আমার এই শহরটার ক্ষতি করতে চাইবে আমি তাকে সহ্য করতে পারব না।

কাজল বললেন, আমি জানি দাদা, কিন্তু ও যে বুঝতে পারছে না। ওর মতে যা অন্যায় তার প্রতিবাদ ও করবেই। কিন্তু আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমার এই সুখটুকু আপনি কেড়ে নেবেন না।

গুপ্ত বললেন, আজকের কাগজে একটা ঘোষণা রয়েছে, দেখেছ?

কাজল মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ।

ওটা কি অপরেশ লিখছে?

কাজল একটু ইতস্তত করলেন। মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না তিনি। নিচু গলায় জবাব দিলেন, সেই রকম শুনছিলাম।

তাহলে? তাহলে বোঝ। না, না আমি আর কিছু করতে পারি না। বউমা, তোমার বাড়ির ছাদে যদি ক্র্যাক হয় আর ছাদ সারানোর টাকা যদি তোমার না থাকে তাহলে কি বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দেবে তুমি? গুপ্ত হাসলেন, তোমার স্বামী সেইরকম পাগল। ঠিক আছে, তুমি তাকে বলো যদি সে আজই গিয়ে ওই লেখাটা তুলে নিয়ে চুপ করে থাকে তাহলে আমি কিছু বলব না। এর চেয়ে আর কোনও ভালো প্রস্তাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না।

কথাটা বলে গুপ্ত আর দাঁড়ালেন না। সোজা গাড়ি চালিয়ে সমাজপতির অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। অফিসের সামনে হকারদের বেশ ভিড়। গুপ্ত বুঝলেন আগামীকালের কাগজের জন্যে অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। অবিনাশ ছোকরাই ওই সব দেখাশোনা করে। কিন্তু

সে নেই। নতুন একটা ছেলে এই কাজ করছে। তার মানে সমাজপতি নতুন লোক রাখার মতো ক্ষমতায় এসেছে। চমৎকার।

ঘরে ঢুকে নিরাশ হলেন গুপ্ত! সমাজপতি নেই। কোথায় যে গিয়েছে তা কেউ বলতে পারল না। তার মানে গা-ঢাকা দিয়েছে লোকটা। সে ফিরলেই যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই নির্দেশ দিয়ে তিনি আবার গাড়িতে উঠলেন। ঠিক করলেন, বেলা একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন আর তারপরেই সেনকে বলবেন ওকে খুঁজে বের করতে।

রাস্তায় এসে চারিদিকে তাকাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল গুপ্তর। ওদিকে নতুন রোদ গায়ে মেখে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করছে আর রাস্তায় রঙিন জামাকাপড় পরা ট্যুরিস্টদের ভিড়। আর এই ছবিটাকে ওরা নষ্ট করতে চায়, মনে-মনে বললেন গুপ্ত। না, কিছুতেই তা হতে দেবেন না তিনি।

হাসপাতালে আজ আরও চারজন ট্যুরিস্ট ভর্তি হল। অপরেশ বুঝতে পারছিলেন সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। অবিলম্বে চামড়ার কারখানাটা বন্ধ করা দরকার। এই হাসপাতালে যেক'টা বেড আছে তা ভর্তি হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। তখন কী অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারছেন না তিনি। দুপুরে বাড়িতে খেতে আসবার সময় মনে-মনে এই সব চিন্তা করছিলেন অপরেশ।

ওরা তাঁর কথা শুনল না। কয়েক লক্ষ টাকা মানুষের জীবনের চেয়ে বড় হল। আজ সকালে তাঁকে মেডিক্যাল অফিসারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসি পেল অপরেশের। তাতে তাঁর কী এসে যায়! দুশো টাকা আয় কমবে, তার বেশি কিছু ঘটবে না। সমাজপতি যদি লেখাটা ছাপে তাহলে নিশ্চয়ই শহরের মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। সেই জনমতের চাপে দাদারা মেনে নিতে বাধ্য হবেন দাবিগুলো।

বাড়িতে ফিরতেই কাজল কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ ফোলা এবং চোখ লাল! বোঝা যাচ্ছে কান্নাকাটি হয়েছে বেশ।

অপরেশ উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে?

কাজল স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, তুমি কী চাও?

মানে? বুঝতে পারলেন না অপরেশ।

বিয়ের পর থেকে একটা দিনের জন্যে তুমি আমাকে সুখ দাওনি। চিরদিন তোমার বাউন্ডুলেপনার জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে মরেছি। তোমার ওই পরোপকারের ঠেলায় আমার সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছি। শেষপর্যন্ত এখানে এসে ঠাকুর আমাকে যখন স্বাচ্ছন্দ দিতে চাইলেন তখন তুমি আবার আমাদের সর্বনাশের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ। কেন, জবাব দাও, আমরা কী ক্ষতি করেছি তোমার! তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন কাজল। তাঁর চোখদুটো জ্বলছিল।

অপরেশ স্ত্রীর এই চেহারা আগে কখনও দেখেননি। কিছুক্ষণ ওঁর দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় শুধোলেন, কী বলছ তুমি!

কী বলছি বুঝতে পারছ না? তোমার কী দরকার দাদার পেছনে লাগার? এই শহরের মানুষ তোমাকে দেখবে? তোমাকে খেতে-পরতে দেবে? না, কেউ দেবে না। তোমার দাদা সেটা দিয়েছেন। আজ উনি আমায় স্পষ্ট বলে গেলেন, তুমি যদি এসব

করো তাহলে উনি ছেড়ে কথা বলবেন না। তার ফল নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন কাজল।

অপরেশ বললেন, কাজল, এতদিন যখন তুমি আমার সঙ্গে কষ্ট ভাগ করে নিয়েছ তখন কালও পারবে। তুমি যদি আমার পাশের না দাঁড়াও তাহলে আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব কী করে?

কাজল এবার কেঁদে ফেললেন, তোমার কী দরকার একা-একা লড়াই করার! পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, তারা করুক। দোহাই তোমার, তুমি আমার এই সুখ কেড়ে নিও না।

অপরেশ এগিয়ে এসে স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলেন, পৃথিবীতে অনেক লোক, ঠিক কথা, কিন্তু একজনকে না একজনকে প্রথমে লড়াই শুরু করতে হয়। তাই না? কনকপুরে সেই কাজটা না হয় আমিই করলাম। তুমি এত চিন্তা করো না। আমরা তিনটে তো প্রাণী, একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। মেয়ে তো চাকরি করছে, তোমার ভয় কী!

এইরকম মিষ্টি কথায় কাজলের মন ভরছিল না। তিনি নিশ্চিত নিরাপত্তা আর হারাতে চান না। স্বামীকে বারংবার বোঝাতে চাইলেন তিনি। কিন্তু কোনও কথা শুনতে চাইলেন না অপরেশ।

ওঁদের যখন কথা কাটাকাটি তুঙ্গে তখন সুর্মা ফিরল। হাতে দুটো বই, মুখে হাসি। কাজল তাকে দেখে এগিয়ে গেলেন, তুই তোর বাবাকে বুঝিয়ে বল, আমার কথা শুনতেই চাইছেন না।

সুর্মা ঈষৎ অবাক হল, কী ব্যাপার?

অপরেশ কথা বললেন, আমাকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে বলছে তোর মা। এই শহরের মানুষগুলো বিষে আক্রান্ত হবে জানা সত্ত্বেও আমাকে চুপ করে থাকতে হবে। না, এ অসম্ভব। ও এই বাড়ি, স্বাচ্ছন্দ হারাতে চাইছে না। আমি বললাম, তুমি শক্ত হও, আমার পাশে এসে দাঁড়াও।

তুই কী বলিস?

সুর্মা বলল, বাবা ঠিকই বলেছে মা।

কাজল ফুঁসে উঠলেন, তুইও একই কথা বলছিস?

অপরেশ পরিহাসের গলায় বললেন, এখন তোমার মেয়ে চাকরি করছে, তুমি তো আর জলে গিয়ে পড়বে না।

সুর্মা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, না বাবা, এই মুহূর্তে আমি আর চাকরি করছি না। আমাকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কাজল প্রায় দৌড়ে এলেন মেয়ের কাছে, কী বললি? তোর চাকরি নেই?

সুর্মা মাথা নাড়ল, না। স্কুল কমিটি আমার কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট নয়, আজ একটু আগে জানিয়ে দিয়েছে আমাকে।

ফ্যাকাশে গলায় কাজল বললেন, কেন, তুই তো খুব ভালো পড়াস, সবাই কত সুখ্যাতি করে, তা হলে—? স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি, মেয়েটার চাকরি গেল কেন? কেন তোমাকে মেডিক্যাল অফিসারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বুঝতে পারছ না?

এর পরেও তুমি তোমার গোঁ ছাড়বে না! দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো।

কিন্তু এসব কথা অপরেশের মাথায় ঢুকছিল না। তিনি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কর্তৃপক্ষ তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করল! কিন্তু সুর্মা কী দোষ করল? ওর ওপর আঘাত হানল কেন ওরা? ছিছি! ক্রমশ উত্তপ্ত হতে আরম্ভ করলেন তিনি। চোখ রাঙিয়ে তাঁকে থামিয়ে রাখতে চায় ওরা? মূর্খের দল সব। কাজল বোকামি করছে, এই ঠুনকো সুখের জন্যে কান্নাকাটি করছে। কিন্তু এত বড় একটা সর্বনাশ আসছে জেনেও কী করে চুপ করে থাকবেন তিনি? নিজের বিবেকের কাছে কী জবাব দেবেন?

না, যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে তখন আর থামার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সমাজপতির কাগজে কালকে লেখাটা বের হলে ওদের টনক নড়বেই। বাধ্য হবে এই সব দাবি মেনে নিতে। অপরেশ ঠিক করলেন, খেয়ে-দেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার আগে একবার সমাজপতির ওখান থেকে ঘুরে যাবেন।

সমাজপতি অফিসে ছিলেন না। অবিনাশও নেই। পথে আসবার সময় সিংজির দোকানে একটু দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে গুঞ্জন শুনছিলেন, খুব মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে কনকপুরে। কালকের কাগজে জানা যাবে। লোকে জল্পনা-কল্পনা করছিল কী হতে পারে। সেটা লোভ হচ্ছিল অপরেশের, বলেই ফেলবেন নাকি! তারপর ভাবলেন, না, লোকে কালকের কাগজটা নিজেরাই পড়ুক। অর্থাৎ উদ্দীপনা শুরু হয়েছে খবরটাকে ঘিরে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবিনাশ এল। এসে তাঁকে দেখে একগাল হাসল, ওফ, সারা শহর পাগল হয়ে গেছে ওই খবরটা জানার জন্যে। আমি তো রাস্তায় হাঁটতে পারছি না পাবলিকের জ্বালায়।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, সমাজপতি কোথায়?

অবিনাশ ওঁর চোখে চোখ রাখল। কিছু একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করল। শেষপর্যন্ত সত্যি কথাটা না বলে পারল না, আঙুল দিয়ে পিছনের একটা ঘর দেখিয়ে দিল। ঘরটার দরজা বন্ধ।

অপরেশ বললেন, সে কি! ওখানে আছেন কেন?

পালিয়ে আছেন। ঘন-ঘন লোক আসছে ওঁকে ধরতে। স্বয়ং গুপ্তসাহেব হানা দিয়ে শাসিয়ে গেছেন। আমরা বলেছি, উনি নেই। অবিনাশ হাসল।

আমার লেখাটা কম্পোজ করা হয়ে গেছে?

অনেকক্ষণ। প্রুফ দেখে দিয়েছি।

অপরেশের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। যাক বাঁচা গেল! তিনি উঠলেন, তাহলে সমাজপতির সঙ্গে দেখা করা যাবে না?

খুব দরকার আছে?

না, ওঁকে আমি ধন্যবাদ জানাতাম।

ধন্যবাদ তো আপনিই পাবেন। আপনার জন্যেই আজ কাগজের এত নাম। অবিনাশ অপরেশকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে একটা কাগজে লিখল, 'ডাক্তারবাবুর

এসেছিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন। বাইরে দারুণ পাবলিসিটি হয়েছে। দশ হাজার ছাপব?' তারপর কাগজটা দরজার তলা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হতে চমকে ফিরে তাকিয়ে অস্বস্তিতে পড়ল অবিনাশ। গুপ্ত এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখ দরজার নিচে। অবিনাশ দ্রুত উঠে এল।—কী সৌভাগ্য, আসুন-আসুন!

গুপ্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে বললেন, ওখানে কী করছিলে?

একটা পিন পড়ে গিয়েছিল, খুঁজছিলাম। চটপট মিথ্যে বলে ফেলল অবিনাশ।

পিন খুঁজছিলে?

হ্যাঁ।

পেলে?

না। অবিনাশ বুঝল গুপ্ত তাকে সন্দেহ করছেন। সে চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল অকারণে—বসুন।

তোমার মালিক কোথায়?

জানি না। সকাল থেকে যে কোথায় গেলেন, কী জ্বালা আমার।

সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটির মতো অবস্থা হয়নি তো!

মানে?

মেয়েটিকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

অবিনাশের অস্বস্তি বেড়ে গেল। ওই মেয়েটি সম্পর্কে গুপ্ত আরও কোনও খবর জানেন নাকি! মার্ডার হয়ে থাকলে জব্বর নিউজ হবে। কিন্তু সেটা জানার কোনও উপায় নেই। সে চেষ্টা করল ভালোমানুষের মতো মুখ করতে, আপনার যা দরকার তা আমার দ্বারা মিটতে পারে না?

না। চাকর-বাকরদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।

অবিনাশ অপমানটা হজম করল। খুব জরুরি কিছু?

গুপ্ত তাকালেন। তারপর শীতল গলায় প্রশ্ন করলেন, কালকের কাগজে কী খবর বের হচ্ছে?

এইটেই আশঙ্কা করছিল অবিনাশ। সে বুঝল মিথ্যে বলে কোনও লাভ হবে না। তবু সামান্য ব্যাপার এমন ভঙ্গিতে বলল, ও ডাক্তারবাবুর একটা আর্টিকেল। কেন বলুন তো?

সেটাই সন্দেহ করেছিলাম। কী আছে তাতে?

আমি জানি না! সমাজপতিবাবু আমাকেও পড়তে দেননি।

মিথ্যে কথা বলছ।

সত্যি-মিথ্যে জানি না। কিন্তু আপনার এভাবে জানতে চাওয়া উচিত হচ্ছে? এতে কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় আপনি হস্তক্ষেপ করছেন না?

তাই নাকি? খুব শীতল গলা গুপ্তর।

নিশ্চয়ই, এসব করলে সারা দেশে ঝড় উঠবে। স্বয়ং প্রেসিডেন্টও এত সাহস পান না। এটা আপনার উচিত হচ্ছে না।

হচ্ছে। কারণ যে সংবাদপত্র এতদিন ভাঁওতা আর ভণ্ডামি করে বেঁচেছিল তার

স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না। স্বাধীনতার কথা সে-ই বলতে পারে যে সৎ, আদর্শবান। তোমার মালিককে জিজ্ঞাসা করো অ্যাদ্দিন সে কী করেছে। ঝড় উঠবে? ওঠাচ্ছি ঝড়! কই লেখাটা দাও। গুপ্ত হাত বাড়ালেন।

আমার কাছে নেই। তা ছাড়া, সেসব ছাপা হয়ে গেছে।

ছাপা হয়ে গেছে! তোমাদের তো রাত্রে ছাপা হয়।

হয়, কিন্তু এটা ইমার্জেন্সি বলে—

কত কপি ছেপেছ সত্যি কথা বলো!

দশ হাজার।

মিথ্যে কথা।

কথাটা বলা মাত্র অবিনাশ ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। সেখানে একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে। ওর দৃষ্টির অনুরসণ করে গুপ্ত কাগজটা দেখলেন। তারপর গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন, ওটা তুলে আনো।

কোনটা?

ওই কাগজটা। তুমি ওটা নিয়ে তখন কিছু করছিলে। কী ওটা আমি দেখব। যাও নিয়ে এসো। গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন।

অবিনাশ হতাশ গলায় বলল, ওটা এমনি কাগজ। মূল্যহীন।

গুপ্ত নিজেই উঠলেন। নিচু হয়ে কাগজটা কুড়িয়ে ভাঁজ খুললেন, পাঁচ হাজার। তারপর হতভম্ব গলায় বললেন, পাঁচ হাজার মানে? ওহো, পাঁচ হাজার ছেপেছি। অবিনাশ ম্যানেজ করার চেষ্টা করল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন গুপ্ত—ওই দরজাটা বন্ধ কেন?

দরজা! ফ্যাকাশে গলায় বলল অবিনাশ, এমনি!

খোলো।

কেন?

আমি দেখব। কথাটা শেষ করেই গুপ্ত এগিয়ে গিয়ে দরজায় আঘাত করলেন। ভেতর থেকে বন্ধ, কোনও সাড়া এল না। গুপ্ত অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোন করো এখনই যেন ফোর্স নিয়ে চলে আসে। মনে হচ্ছে যে মেয়েটিকে পাচ্ছি না সে এখানে আছে।

কী বলছেন! হাঁ হয়ে গেল অবিনাশ—সেই মেয়েটি ওখানে থাকতে যাবে কেন? আমরা তো তাকে চিনিই না। দেখিনি।

সেটা খুললেই প্রমাণিত হবে। আমরা সন্দেহ করছি, সন্দেহের বশে আমরা যে-কোনও জায়গা সার্চ করতে পারি। ফোন করো।

অবিনাশ এবার হাল ছেড়ে দিল। সে বুঝল, ধরা পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই গুপ্ত দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে কাগজ ঢোকাতে দেখেছেন। শালা, ওটা বন্ধ না করে কী ভুলই হয়েছে। পুলিশ ডাকলে কেলোর কীর্তি হবে যখন, তখন নিজে থেকেই ধরা দেওয়া ভালো। সে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখল, 'উপায় নেই বেরিয়ে আসুন।' তারপর কাগজটাকে ভাঁজ করে দরজার তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

গুপ্ত সেটা লক্ষ করে সরে এলেন। এসে একটা চেয়ারে বসে বললেন, বাইরের

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও।

বেরিয়ে যাব? আমার যে এখানে অনেক কাজ আছে।

আমি বলছি নেই তাই যাবে। যাও—

অবিনাশের মনে হল এই মুহূর্তে সমাজপতির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। সে আর দাঁড়াল না, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই ভেতরের দরজার পাল্লা নড়ল। একটু-একটু করে সমাজপতির মাথাটা বাইরে বেরিয়ে এল। তারপরেই গুপ্তকে দেখতে পেয়ে সট করে সেটা ভেতরে চলে গেল। গুপ্ত ডাকলেন সমাজপতি—

বলুন স্যার। গলায় বেশ কাঁপুনি।

ওখানে কী করছ?

ধ্যান করছিলাম। সপ্তাহে একদিন আমি দরজা বন্ধ করে ধ্যান করি স্যার। আপনি আমার ধ্যানভঙ্গ করলেন কেন, কী প্রয়োজন? আস্তে-আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন সমাজপতি।

পালিয়ে আছ কেন? আমায় বাঁশ দিতে?

গুপ্তর মুখে এ ধরনের সংলাপ কখনও শোনেন নি সমাজপতি। তিনি কোনওরকমে বললেন, আপনি কী বলছেন স্যার?

কালকের কাগজ শুনলাম ছাপা হয়ে গেছে, তাই নাকি?

কী উত্তর দেবেন বুঝতে না পেরে সমাজপতি ঘাড় নাড়লেন। যার দুটে অর্থ হতে পারে।

গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও তোমার কাগজটা উঠে যাক?

না। আমি চাই না।

কিন্তু ওই লেখা ছাপলে তাই হবে। লেখা পড়ামাত্র শিক্ষিত মানুষরা শহর ছেড়ে পালাবে। তখন কার কাছে কাগজ বিক্রি করবে? জঙ্গলের আদিবাসীরা নিশ্চয়ই তোমার কাগজ কিনবে না। মূর্খ।

সমাজপতির মনে হল গুপ্ত বাড়িয়ে বলছেন কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করতে চাইলেন না।

গুপ্ত কোনও জবাব না পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ?

হ্যাঁ স্যার।

তা হলে নিজেকে বাঁচাও, শহরটাকে বাঁচাও। কালকের যত কাগজ ছেপেছ তা যেন বাজারে বের হয় না। তোমার ক্ষতি হোক আমি চাই না। তোমার যত খরচ হয়েছে আমি তা পুষিয়ে দেব। টাকাটা আমার বাড়ি থেকে বিকেলে গিয়ে নিয়ে এসো। রাত্রে একটা লরি আসবে, সেখানে সব কাগজ তুলে দিও, বুঝলে?

কী করবেন ওগুলো নিয়ে?

পুড়িয়ে ফেলব।

কিন্তু আগামীকাল কাগজ না বের হলে পাবলিক আমাকে মেরে ফেলবে। কত অ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছি জানেন? সমাজপতি প্রায় আর্তনাদ করলেন।

কাগজ বের হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে।

কিন্তু কী ছাপব? লোকে তো খবরটার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

হেডলাইন দাও, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কনকপুরে তিমিদের আড্ডা ছিল। সম্প্রতি লেকের জলে—না-না লেক নয়, উত্তরের পাহাড়ে তাদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ব্যস। গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

সমাজপতি হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন গুপ্ত মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের একটু আগে একটা ঝকঝকে দামি গাড়ি অপরেশের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ধুতি-পাঞ্জাবি এবং শাল গায়ে এক সুদর্শন মানুষ গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই বারান্দার চেয়ারে বসা কাজল উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না জামাইবাবু এখন আসবেন।

দাশগুপ্ত হাসলেন—কী ব্যাপার, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?

হচ্ছি। আজকাল তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।

তা অবশ্য। ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি। আসলে আমি যদি সমতলে কারখানা করতাম তা হলে অনেক খরচ কম হতো, নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারতাম। কিন্তু এই শহরটাকে এমন ভালোবেসে ফেলেছি যে এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। তাই আর সময় পাই না। তা তোমরা আছ কেমন? আমাদের ওদিকে তো আর যাও না।

কাজলের বাড়িয়ে দেওয়া চেয়ারে সন্তর্পণে বসলেন দাশগুপ্ত। বয়স হয়েছে, অপরেশের চেয়ে বড়, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

ভালো নয়।

কেন?

তুমি জানো না!

উঁহু।

তা হলে এসেছ কেন?

ও! তা হলে তোমরা প্রস্তুত হয়েই লড়ছ। দাশগুপ্তর গলা শক্ত হল।

লড়ছি?

লড়ছ না? আমার আত্মীয় হয়ে আমার বিরুদ্ধে পাবলিককে উস্কানি দিচ্ছে তোমার স্বামী। সেটাকে কী বলে?

কাজল বললেন; আমি এসব কিছু জানি না। উনি বলছেন, তোমার কারখানার চামড়া ধোওয়া জলের জন্যে শহরের জল দূষিত হয়েছে।

অসম্ভব। হতেই পারে না। আমার কারখানার সমস্ত ব্যাপারই বৈজ্ঞানিক মতে তৈরি। আমার চামড়ার জল শহরের জলের পাইপে মিশবে কী করে? কিছু মনে করো না, তোমার স্বামী দেবতাটির মাথায় একটি বিশেষ পোকা আছে, সেটি মাঝে-মাঝেই কামড়ায়। আমি ব্যবসা করি বলে ও বোধহয় কোনওদিনই আমাকে পছন্দ করল না। তোমার দিদি এসব শোনা অবধি কান্নাকাটি শুরু করেছে। দাশগুপ্ত হাসলেন।

কাজল বললেন, কী করব জামাইবাবু জানি না। উনি তো কারও কথা শুনতে চাইছেন না। এমনকী মেয়েটার যে চাকরি গেল তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

সে কি কথা! সুর্মার চাকরি নেই! কী হয়েছে?

জানি না। আজ স্কুল থেকে ফিরে এসে বলল বরখাস্ত হয়েছে।

দাশগুপ্ত একটু যেন চিন্তা করলেন—যাক-যাক, ওরকম বকবকানির চাকরি না করাই ভালো। ওকে একটু ডাকো তো। আমি কথা বলি।

কাজল সুর্মাকে ডেকে আনতেই দাশগুপ্ত বললেন, আয় মা, কেমন আছিস?

সুর্মা সামান্য ঘাড় নাড়ল—ভালো। আপনি?

আমি? তোর বাবা কি আর আমাকে ভালো থাকতে দিচ্ছে? যাক সে কথা, শুনলাম স্কুলের চাকরি নাকি আর নেই? দাশগুপ্ত ভ্রূ কোঁচকালেন।

ঠিক শুনেছেন।

চাকরির জন্যে চিন্তা করিস না। তুই এক কাজ কর, কাল থেকে আমার কারখানায় লেগে যা। কদিন থেকে ভাবছিলাম একটা পাবলিক রিলেশন অফিসার রাখব। আমি একা সব সামলাতে পারছিলাম না। তুই আয়, তোকে সব বুঝিয়ে দেব। স্নেহের হাসি হাসলেন দাশগুপ্ত।

কাজল বললেন, সত্যি জামাইবাবু! আঃ, ভগবান তুমি কী ভালো।

দাশগুপ্ত হাত ঘুরিয়ে বললেন, বাঃ, আমি চাকরির খবর দিচ্ছি আর ভালো হয়ে যাচ্ছে ভগবান! কী রে, তুই কী বলিস?

সুর্মা নিচু গলায় উত্তর দিল, অফিসে চাকরি নেওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।

কেন? দাশগুপ্ত অবাক হলেন—অফিস কী অপরাধ করল? ও, নিরাপত্তার কথা বলছিস? আরে আমার ফ্যাক্টরিতে তোর কোনও অসুবিধে হবে ভাবছিস কেন? ও তো তোর নিজেরই অফিস!

তা নয়। আমি বাবার সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু বলতে পারব না।

তাই নাকি? সে যদি রাজি না হয়?

সেটাই স্বাভাবিক। বাবা মনে করেন আপনার কারখানাটা শহরের জল বিষাক্ত করছে। সেই কারখানায় আমি কাজ করলে আপনাকেই সাহায্য করা হবে। যদি আপনি অন্য জায়গায় কারখানা সরিয়ে নিয়ে যান তখন অবশ্য এই বাধা থাকবে না। সুর্মা কথাগুলো বলল কাটা-কাটা, স্পষ্ট গলায়।

দাশগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন, বুঝলাম। বাপ-মেয়ে সব এক পালকের।

সুর্মা জবাব দিল, শুধু পালক বলছেন কেন মেসোমশাই, রক্তও তো এক, লাল রঙের।

কাজল তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, কী বলছিস, তুই! বয়স্ক লোকের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে হয়! আপনি কিছু মনে করবেন না জামাইবাবু। চাকরি যাওয়ার পর ওর মাথা ঠিক নেই।

দাশগুপ্ত ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন, না কাজল, ওর মাথা ঠিক আছে। কিন্তু এই তেজ আর বেশি দিন থাকবে না। আমি তোমাদের ভালো করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা শুনলে না।

কাজলের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও দাশগুপ্ত আর দাঁড়ালেন না। ওঁর গাড়ি চলে গেলে কাজল মেয়ের দিকে ফিরে তাকালেন। সুর্মা দাঁতে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হিসহিসে গলায় কাজল জিজ্ঞাসা করলেন, এটা তুই কী করলি?

কেন মা?

যেচে এসে চাকরি দিতে চাইল, তুই পায়ে ঠেললি?

ওটা একটা টোপ, বাবাকে ফাঁদে ফেলবার।

কাজল ফুঁসে উঠলেন, না খেয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে টোপ খাওয়া ঢের ভালো, ওতেও খাবার থাকে। তোরা বাপ-মেয়েতে মিলে আমাকে জ্বালিয়ে শেষ করে ফেললি। ও ভগবান, তুমি এত কষ্ট দেবে আমাকে!

সে কি! একটু আগে বললে ভগবান তুমি কি ভালো—সুর্মা হাসল।

চুপ কর! তোমাদের এই সব পাগলামি আমি সহ্য করব না। আসুক সে আজ, আমি হেস্তনেস্ত করব। এই বুড়ো বয়সে আমি আর ভিখিরি হতে পারব না!

তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ মা! অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে সারাজীবন মেরুদণ্ড খুইয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো।

কাজলের চোখ জ্বলছিল—শোনো, তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। ওই সুব্রতর সঙ্গে তোমার আর মেলামেশা চলবে না। তাকে এই বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিও।

সুর্মা চমকে উঠল—সে কি! কেন? সে আবার কী দোষ করল?

তুমি জানো না? ওর বংশটাই পাগল। আমি চাই না তোমার ভবিষ্যত ঝরঝরে হয়ে যাক।

তা তো ঠিক। কিন্তু সুব্রত তো পাগল নয়।

পাগলের ছেলে পাগল হয়।

তা হলে তো কবির ছেলে কবি, ডাক্তারের মেয়ে ডাক্তার হতাম।

বাজে কথা ছাড়, যা বললাম তাই করবে।

না মা, সুব্রত যদি কখনও পাগল হয়েই যায় তখন ওকে সারানোর জন্যে ওর পাশেই আমার থাকা দরকার।

তা হলে তোরা কেউ আমার কথা শুনবি না! চিৎকার করে উঠলেন কাজল। সেই সময় সুর্মার চোখ বাইরের দিকে গিয়েছিল। সে নিচু গলায় বলল, চুপ করো মা, বাবা আসছে।

কাজল মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন গেট খুলে অপরেশ ঢুকছেন। এখন তাঁর মোটেই হাসপাতাল থেকে ফেরার কথা নয়। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে, অন্যমনস্ক। প্রায় বারান্দার কাছাকাছি এসে অপরেশ ওদের দেখতে পেলেন যেন।

সুর্মা ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ওঁর হাত ধরেছে, কী হয়েছে বাবা?

অপরেশ ম্লান হাসলেন—যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে মা। আমাকে একটু বসতে দে।

সুর্মা চেয়ার টেনে আনল কাছে। অপরেশ সেটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সামনে তাকালেন। বিকেলের পরিষ্কার রোদ পড়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর। কী নির্মল দেখাচ্ছে

তাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি—ভালোই হল। এখন আর কোনও বাধা রইল না।

কাজল ওঁকে এতক্ষণ দেখছিলেন। এবার কাছে এসে শুধোলেন, কী হয়েছে তোমার? ওঁর গলার স্বর এখন খুব নরম।

অপরেশ বললেন, আজ থেকে আমি বেকার হলাম। আমার কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে কর্মকর্তা আমাকে বরখাস্ত করেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে কাজলের মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তিনি আর দাঁড়ালেন না, এক ছুটে ভেতরে চলে গেলেন। অপরেশ নীরবে তাঁর যাওয়া দেখলেন। তারপর দু হাতে মাথা চেপে বসে রইলেন।

একটু সময় নিয়ে সুর্মা বাবার মাথায় আলতো করে হাত রাখল—বাবা! অপরেশ মুখ তুললেন—আমি বোধহয় তোর মায়ের ওপর অবিচার করলাম। আমার হাতে পড়ে বেচারি কোনওদিন সুখী হতে পারল না।

সুর্মা গাঢ় গলায় বলল, মা এখন বুঝছেন না, পরে নিশ্চয় ওঁর ভুল ভাঙবে। তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি বাবা।

অপরেশ এবার সোজা হয়ে বসলেন—না, আমি কোনও অন্যায় করিনি। কালকের কাগজটা বের হোক তারপর দেখবি সমস্ত শহর আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। এদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতেই হবে।

সুর্মা জিজ্ঞাসা করল, ওরা কি আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে?

হ্যাঁ, তবে একমাস সময় দিয়েছে। এর মধ্যে কোথাও একটা বাড়ি খুঁজে নিতে হবে। সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কী বলিস?

হ্যাঁ। আমি আজই সুব্রতকে বলব।

সুব্রতকে? ওকে আমাদের সঙ্গে জড়ালে ওর কোনও ক্ষতি হবে না তো?

আমরা জড়াব কেন? ওর যদি ইচ্ছে হয় তবে—

অপরেশ ধীরে-ধীরে উঠলেন। তারপর নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে এলেন। সুর্মা বাবাকে একা যেতে দিল। ও জানে অপরেশ কাজলের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেন না।

কাজল শুয়েছিলেন বিছানায় উপুড় হয়ে, ওঁর পিঠ কাঁপছিল। অপরেশ বিছানায় বসে ওঁর পিঠে হাত রাখতেই কাঁপুনিটা থেমে গেল। ভাঙা গলায় অপরেশ বললেন, তুমি যদি এমন করে ভেঙে পড়ো তা হলে আমি কী করে সোজা হয়ে দাঁড়াই? আমাকে তুমি অন্ধ হয়ে থাকতে বলো?

হঠাৎ কাজল ঘুরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীর কোলে। মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে যেতে লাগলেন। ওঁর দুটো হাত স্বামীকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল অপরেশের। তখনও অন্ধকার কাটেনি। কিছুক্ষণ ছটফট করে উঠে পড়লেন তিনি। আজ সকালের কাগজটার জন্যে বাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছিল না। কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন তিনি। যে ছেলেটি কাগজ দেয় সে সাতটার আগে যেন আসতেই চায় না।

বেশ কনকনে ঠান্ডা এখন বাইরে, ট্যুরিস্টরাও বের হয়নি। হাঁটতে-হাঁটতে

অপরেশের এই সকলের চেহারায় কনকপুরকে নতুন করে ভালো লাগল। এত সুন্দর জায়গাটাকে কিছুতেই নষ্ট করতে দেবেন না তিনি। আজকের খবরের কাগজ বের হলেই কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে ভাবতে পারছেন না তিনি। সাধারণ মানুষ কি ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবে? না, সেটা করা উচিত হবে না। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন, যাতে কেউ মাথা গরম না করে। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবেন মেনে নিতে।

কাগজের অফিসের সামনে এসে দেখলেন সেখানে বেশ ভিড়। প্রচুর হকার এসেছে কাগজ নিতে। কিছু-কিছু সাধারণ মানুষও এসেছে কৌতূহলী হয়ে। সমাজপতি আজ কয়েকজন লোক রেখেছে বাড়তি কাজের জন্যে। অপরেশ দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন। একটু বাদেই কাগজ এল। হকাররা হুড়োহুড়ি করছে কাগজের জন্যে। যে লোকটা বিতরণ করছে সে চিৎকার করছে, জবর খবর! জবর খবর!

অপরেশ আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দৌড়ে কাছে গিয়ে পকেট থেকে পয়সা বের করে একটা কাগজ কিনে নিলেন। ভাঁজটা খুলে চোখের ওপর হেডলাইন ধরতেই ওঁর মাথাটা ঘুরে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। এ কী লেখা রয়েছে?

সমস্ত শরীর টলছিল তাঁর। আঙুলগুলো শিথিল হয়ে যাওয়ায় কাগজটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আবার ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলেন কাগজটা। 'পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কনকপুরে তিমিরা ঘুরে বেড়াত।' ভেতরের বিস্তারিত বিবরণ আর পড়তে প্রবৃত্তি হল না। নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে। সমাজপতি, অবিনাশরা আগামীকালের জন্যে কি খবরটা চেপে রেখেছে? অপরেশ প্রায় দৌড়ে, মানুষের গায়ে ধাক্কা দিয়ে কাগজের অফিসে ঢুকলেন। ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপর দুটো পা তুলে সমাজপতি চুরুট খাচ্ছিল। ওঁকে দেখে যেন চুপসে গেল। তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে হাসবার চেষ্টা করল—কী ব্যাপার?

সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি! অপরেশের গলা বুজে আসছিল।

ও, আপনি তিমিদের কথা বলছেন? হ্যাঁ তিমি ছিল, অক্টোপাস ছিল। মানে এখানে তো ওই সময় সমুদ্রের ঢেউ খেলত। আর সমুদ্র থাকলেই—

চুপ করো। আমার লেখাটার কী হল? চিৎকার করলেন অপরেশ।

কী লেখা? সমাজপতির মুখে না বোঝার ভান।

তুমি জানো না! যে লেখা পেয়ে তোমরা কাল অ্যানাউন্সমেন্ট দিলে সে লেখা তুমি পড়োনি? আজ সেইটাই ছাপা হওয়ার কথা ছিল না?

ছিল। ছেপেছিলাম। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

কী বলছ! ছাপা হলে এটা কী?

এটা লেক্সট এডিশন। দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, কাগজটাকে চালাতে হবে। আপনার কল্পনার ওপর তৈরি খবর ছেপে বিপদে পড়তে চাই না। এতক্ষণে সাফ জানিয়ে দিলেন সমাজপতি।

কল্পনা! এ কী বলছ! কলকাতা থেকে পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট এনেছিলাম। অবিনাশ, অবিনাশ কোথায়?

সে ঘুমুচ্ছে। রিপোর্টটা লেখার আগে দেননি কেন?

ওটা যে আমার কাছে নেই।

ডাক্তারবাবু, এসব চিন্তা ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দেব! কক্ষনও না। আমি জনে-জনে বলে বেড়াব, মিটিং করব, কনকপুরের মানুষের কাছে নিজে যাব, তাদের বলব, ওই জলে বিষ আছে তোমরা খেও না। জল ফুটিয়ে বিষমুক্ত না করলে মহামারী হবেই। দেখি আমায় কে ঠেকায়! সমাজপতি, তুমিও শেষ পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেলে! ছি-ছি-ছি! পাগলের মতো মাথা নাড়ছিলেন অপরেশ।

সমাজপতির গলা আচমকা পালটে গেল, সত্যি বলছেন, জল না ফুটিয়ে আর খাব না?

অপরেশের কানে প্রশ্নটা যেতে তিনি স্থির হয়ে গেলেন। তার পরে এক ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এদিকে সেখানে তখন চেঁচামেচি চলছে। হকাররা এর মধ্যে ভাঁওতাটা বুঝে গিয়েছে। তারা আগের অর্ডার অনুযায়ী কাগজ নিতে চাইছে না।

অপরেশ ভারী পায়ে পুরোটা পথ হেঁটে বাড়ি এলেন। ওঁর শরীর টলছিল। বারান্দায় সুর্মা দাঁড়িয়ে ছিল। ওঁকে দেখে চিৎকার করে দৌড়ে এল—তোমার কী হয়েছে বাবা!

অপরেশ হাসলেন—প্রথম রাউন্ডে হেরে গেলাম মা।

হেরে গেছ? মানে?

সমাজপতি খবরটা ছাপেনি। ভয় পেয়েছে সে। কনকপুরের মানুষকে জানানোর সহজ পথটা তোর জেঠু বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে আমি দমছি না। এর পরের রাউন্ড তো আমার হাতের মধ্যে। সেখানে আমায় কে হারায় দেখি! তুই এক কাজ করবি মা?

বলো?

দোকান খুললেই শ'খানেক পোস্টার সাইজের কাগজ কিনে আন। সেই সঙ্গে রঙ তুলি কিংবা ওই যে সব রঙিন কলম বেরিয়েছে তার কয়েকটা। আমাতে-তোতে মিলিয়ে আজ পোস্টারগুলি লিখে ফেলি। রবিবার বিকেলে চৌমাথায় আমি একটি ভয়ঙ্কর সংবাদ জানাব। সেই জন্যে সবাই যেন সেখানে আসে। তারপর পোস্টারগুলো সমস্ত শহরে ছড়িয়ে দেব। আর-একটা কাজ করতে হবে। সুধীরের দোকানে বলে দিতে হবে রবিবার বিকেলে আমার একটা ভালো মাইক চাই। পারবি তো?

নিশ্চয়ই পারব বাবা।

গুড, আমরা কনকপুরের পাড়ায়-পাড়ায় সভা করে মানুষকে বলব ঘটনাটা। খবরের কাগজ যারা পড়তে পারে না তারাও শুনবে।

ঘরময় পোস্টারের কাগজ, বাপ-মেয়েতে মিলে জনসভায় যোগদানের কথা লেখা হচ্ছিল। লেখাগুলো অগোছালো হলেও আন্তরিকতা ছিল। কাজল এসে দরজায় দাঁড়ালেন। এই সব কাণ্ড দেখে তাঁর অবাক-বোধও কাজ করছিল না। এই সময় সুব্রত এল। এসে বলল, কাকাবাবু, আমার এখানকার পাট চুকল। কাজল ওকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন, কথাটা শুনে আগ্রহী হলেন।

সুর্মা বলল, তার মানে?

এতদিন কনকপুর ছেড়ে বাইরে চাকরি নিয়ে যাওয়ার কথা হলেও যেতে পারতাম

না। জায়গাটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল বড্ড, চাকরিটা পিছু টানত। আজ থেকে মুক্ত হলাম। কনকপুর ডেভেলপমেন্ট আমাকে আর চায় না। সুব্রত হাসল।

কাজল বলে উঠলেন, তোমারও চাকরি গেল?

হ্যাঁ। কর্তৃপক্ষ আমার কাছে সন্তুষ্ট নয়।

অপরেশ বললেন, পোস্টার লিখছি। এই শহরের মানুষকে বাঁচাতে হবে। ওরা আমার লেখাটা কাগজে ছাপাতে দেয়নি। কিন্তু পোস্টার লেখা তো বন্ধ করতে পারবে না।

সুব্রত ঝুঁকে পোস্টারগুলো দেখল, আর-একটু ডাইরেক্ট করলে হতো না?

কীরকম? অপরেশ বুঝতে পারলেন না।

উদ্দেশ্যটা আরও স্পষ্ট লিখলে লোকের ইন্টারেস্ট বাড়ত।

সুর্মা মুখ ঘুরিয়ে বলল, উপদেশ না দিয়ে নিজে কলম ধরলেই তো হয়। অপরেশ হেসে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন তো তুমি আমাদের চাকরি-হারাদের দলে ভিড়ে গেছ। অতএব এসো, বসে পড়ো, একসঙ্গে প্রতিবাদ লিখতে শুরু করি।

সুব্রত সুর্মাকে বলল, তুমি সরো, বরং এক কাপ চা করে নিয়ে এসো।

দরজায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিলেন কাজল। এবার বললেন, না তুই থাক, আমিই করে দিচ্ছি।

সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। তারপরেই অপরেশের উচ্চস্বর শোনা গেল, বাঃ গুড, আমাদের দলে আর-একজন সৈনিক বাড়ল, নে হাত চালা সব। যুদ্ধে আমাদের কে হারায় তা দেখব!

এইদিন বিকেলে কনকপুরে দুটো ঘটনা ঘটল। একদল উত্তেজিত যুবক সমাজপতির কাগজের অফিস আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দিল। তেমন কিছু ক্ষতি হওয়ার আগেই অবশ্য দমকলবাহিনী আগুন নিভিয়েছে। সমাজপতির মাথায় পাথর পড়েছিল, ফলে দুটো সেলাই করতে হয়েছে। ছেলেরা খুব উত্তেজিত ছিল এই কারণে তারা এই ধরনের তথ্য আশাই করেনি যা ওই দিন ঢাক পিটিয়ে কাগজে ছাপা হয়েছে। গুপ্ত নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন যে, এইভাবে সংবাদপত্র যাতে জনসাধারণকে অকারণে উত্তেজিত না করে সেদিকে তিনি বিশেষ নজর দেবেন। এ ব্যাপারে তিনি কনকপুরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আজ যে ঘটনা ঘটল তা থেকে সংবাদপত্রের মালিক ভবিষ্যতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। যুবকরা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। পুলিশের বড়কর্তা অবশ্য তাদের গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গুপ্ত তাঁকে নিষেধ করেন।

কিছু পরে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে সমাজপতি যখন কাগজের অফিসে ফিরে এলেন তখন গুপ্তই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, কনকপুরের জন্যে তোমার এই আত্মত্যাগ মনে থাকবে।

আত্মত্যাগ? সমাজপতি মিনমিন করছিল, ওরা আমার কী সর্বনাশ করল। হায়-হায় কত কী যে পুড়ে গেল! এ সব আপনার কথা শোনার ফল। আজ অর্ধেক কাগজ বিক্রি হয়নি, সব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে। হায়-হায়, কী দুর্মতি হল আমার! এ আপনি কী করলেন স্যার!

গুপ্ত হাসলেন—ঠিকই করেছি। কনকপুরের ইতিহাসে তোমার নাম লেখা থাকবে। শোনো নার্ভাস হয়ো না, দাশগুপ্ত বলেছে তোমার যা ক্ষতি হয়েছে সব সে পূরণ করে দেবে। তুমি ক্ষতির হিসেব-নিকেশ করে কালই টাকাটা নিয়ে এসো।

কথাটা শোনামাত্রই সমাজপতির মুখ উজ্জ্বল হল—ওঃ, সত্যিই আপনি মহৎ মানুষ। কিন্তু ওই গুণ্ডাগুলোকে কখনই ছাড়বেন না, ওদের অন্তত দশ বছর করে ঘানি ঘোরাবেন।

না হে, ওদের ধরিনি।

ধরেননি!

না। কেননা এটা করতে আমিই ওদের পাঠিয়েছিলাম।

সে কি! সমাজপতি বোবা হয়ে গেল যেন।

হুম। এটা না করলে কনকপুরের যুবসমাজের প্রাণশক্তি কতটা উদ্দাম তা বোঝানো যেত না। এ সব তুমি বুঝবে না সমাজপতি। কথাটা বলে গুপ্ত চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন, তোমার ওই অবিনাশ ছোঁড়াটাকে যত তাড়াতাড়ি পারো বিদায় করো।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল আর-একটু বাদে। সন্ধের অন্ধকার সামান্য গাঢ় হলে দুজন মানুষ দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার মারছে দেখা গেল। একজন আঠা লাগাচ্ছে, অন্যজন সেটাকে দেওয়ালে সাঁটছে। এখন ঠান্ডার কারণে সন্ধের পরই কনকপুর নির্জন হয়ে যায়। ফলে এদের কাজকর্ম তেমন নজর করে দেখার মতো কেউ ছিল না।

পরদিন সকালে সমস্ত কনকপুর যেন নড়েচড়ে বসল। বিকেলে চৌমাথায় জনসভা ডাকা হয়েছে। ডাক্তার অপরেশ গুপ্ত কনকপুরের মানুষকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবহিত করবেন। সেই সঙ্গে স্লোগান, জল ফুটিয়ে পান করুন। কারণ ওতে বিষ আছে।

আটটা নাগাদ গুপ্তর গাড়ি এসে থামল অপরেশের বাড়ির সামনে। একটু আগে সুর্মা শহরের একটা দিক ঘুরে এসেছে। লোক যেতে-যেতে পোস্টারগুলো পড়ছে। অপরেশ বারান্দায় বসে সেই বৃত্তান্ত শুনছিলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের চোখে দেখেন মানুষের আগ্রহ কতটা। শোনার পর বললেন, হুঁ, ওরা কাগজে ছাপেনি তো কী হয়েছে, আমাদের আটকাতে পারল! ঠিক সেই সময় গাড়ির শব্দ হল।

গেট খুলে গুপ্ত দেখলেন ওরা খুব অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার কাজল এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

বারান্দায় উঠে কেউ কিছু বলার আগে গুপ্ত চেয়ার টেনে বসে বললেন, তুমি বক্তৃতা দিতে চাও সে কথা আমাকে বললে না কেন?

অপরেশের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। তিনি বলতে পারলেন, মানে?

আজ বিকালে বৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া, চৌমাথায় ইলেকশানের সময় ছাড়া বক্তৃতা করা নিষেধ। তুমি পুলিশের অনুমতি পর্যন্ত নাওনি। গুপ্ত অনুযোগ করলেন।

আমি জানতাম না। তা ছাড়া, সবাই ওই জায়গাতেই সভা করে থাকে।

করে। কিন্তু তুমি আমার ভাই হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে—না, না, সেটা খুব খারাপ দেখায়। বরং এক কাজ করো, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির বিরাট হলঘর খালি আছে

সেখানেই আজ তোমার বক্তৃতা দাও। গুপ্ত অন্যান্যদের দিকে তাকালেন।

সুর্মা বলল, শীতকালে অ্যাদ্দিন বৃষ্টি হয়নি, আজ হঠাৎ হবে যে।

গুপ্ত কাঁধ নাচালেন—তা আমি কী করে জানব। আবহাওয়া অফিস থেকে তো এই রকমই জানিয়েছে।

অপরেশ বললেন, সবাই জেনেছে আমি চৌমাথায় বলব, হঠাৎ যদি সভার জায়গা পালটে ফেলি তাহলে লোকে জানবে কী করে?

গুপ্ত বললেন, এটা কোনও কথা হল! লোকে যাতে জানতে পারে তাই করব। মাইকে করে সারা শহরে ঘোষণা করে দিচ্ছি তোমার সভার জায়গা পালটাচ্ছি। সবাই জেনে যাবে।

হঠাৎ কাজল বললেন, আপনি যে বড় ওর সভা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন! আমার সব সর্বনাশের মূলে তো আপনি!

গুপ্ত যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্তে চেয়ে থেকে বললেন, ও, শেষপর্যন্ত তুমিও! চমৎকার। তোমাকে আমি সাবধান করে গিয়েছিলাম, আমার যে সর্বনাশ করবে আমি তাকে ছেড়ে দেব না।

তা হলে এসেছেন কেন? সুর্মা ফুঁসে উঠল।

এসেছি, কারণ তোমার বাবা আমার ভাই। আমি চাই না পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করুক। ওর বিরুদ্ধে এর মধ্যেই একটা ডায়েরি হয়েছে। আজ বিকেলে কতকগুলো গুণ্ডাকে দিয়ে ও সমাজপতির অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওর লেখা ছাপা হয়নি বলে। সারা শহর সেই খবরটা জেনে গেছে। পুলিশ কাল রাত্রেই ওকে অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিল, আমিই তাদের থামিয়ে রেখেছি। কথাটা বলে গুপ্ত হতভম্ব মুখগুলোর দিকে তাকালেন।

কী! অপরেশ সোজা হয়ে বসলেন, আমি আগুন লাগিয়েছি! দাদা, এ রকম মিথ্যে কথা তুমি বলতে পারলে?

আমি বলছি না, সমাজপতিই পুলিশের কাছে এ-কথা বলেছে।

মিথ্যে কথা। ষড়যন্ত্র। ওঃ ভগবান! অপরেশ চিৎকার করে উঠলেন। গুপ্ত মাথা নাড়লেন—আমিও তাই মনে করি। কিন্তু মুশকিল হল, পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ এলে তার তদন্ত না করে কোনও উপায় থাকে না। যাক, আমি চাই না তোমাকে নিয়ে এই শহরে কোনও কেচ্ছা হয়। ওই চৌমাথায় বক্তৃতা করাটা ঠিক হবে না। মিউনিসিপ্যালিটি হলঘরে সভা হলে তুমি তোমার বক্তব্য বোঝাতে পারবে, আমরাও আলোচনায় অংশ নিতে পারব। যদি প্রমাণ করতে পারো তুমি সঠিক তা হলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অপরেশ এক মুহূর্ত ভাবলেন। তাঁর মনে হল প্রস্তাবটা ভালো। হলঘরে বক্তৃতা করতে পারলে তিনি অনেক গুছিয়ে কথা বলতে পারবেন এবং ব্যাপারটাও বেশ গুরুত্ব পাবে। তিনি বললেন, বেশ কিন্তু জনসাধারণ যেন জানতে পারে যে সভার জায়গা বদল হয়েছে।

গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কাজলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে বউমা। তবে হ্যাঁ, বলছ যখন, তখন আর মাথা ঘামাব না।

দুপুরবেলায় কনকপুরের মানুষ সভার নতুন জায়গাটার কথা জেনে গেল। সমাজপতির কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে। তাতে ওই সভার খবর আছে এবং জনগণকে সাবধান করা হয়েছে যে অপপ্রচারে যেন না ভোলেন কেউ। এই শহরের জল পবিত্র, স্বাস্থ্যকর। এ নিয়ে কোনও মতভেদ থাকতে পারে না।

বিকেলে মিউনিসিপ্যালিটির হল লোকে লোকে ভরে গেল। অপরেশ সপরিবারে এসেছিলেন একটু আগেই। গুপ্ত, দাশগুপ্ত এসে গেছেন। এই সময় একটি মাতাল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, আমাকে যেতে দাও, আমি একজন সৎ করদাতা। বক্তৃতা শোনার অধিকার আমার আছে। লোকেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল কিন্তু কেউ পথ দিচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে লোকটা বলল, না যেতে দিলে আমি বমি করে ফেলব বলে দিচ্ছি। তখন কাজ হল। সরু প্যাসেজ তৈরি হয়ে গেল আচমকা। লোকটি সেটা দিয়ে টলতে-টলতে সামনে এসে ধপ করে বসে পড়ল।

প্রচণ্ড হট্টগোল চলছি। হঠাৎ সুব্রত মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে মাইকে ঘোষণা করল, আপনারা শান্ত হোন। সভার কাজ এখনই শুরু হচ্ছে।

লোকেরা তাতেও শান্ত হচ্ছিল না। কারণ তারা তখন দুপুরের কাগজটার বিষয়ে আলোচনা করছিল। এই সময় সমাজপতি সারা মাথায়, হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে স্টেজে উঠে এলেন। তাঁর ওই চেহারা দেখে আলো নেভার মতো সব শব্দ থেমে গেল। সমাজপতির পা টলছিল, এত লোকের সামনে কথা বলার অভ্যেস তাঁর নেই। কিন্তু সবাই ভাবল অসুস্থতার জন্যেই ও রকম টলছেন। সুব্রত ওঁকে মাইক ছেড়ে দেবে কি না ভাবছিল কিন্তু জনতা চিৎকার করে ওঁর কথা শুনতে চাইল। বাধ্য হয়ে সুব্রত সরে দাঁড়ালে সমাজপতি মাইক ধরলেন। এতে তাঁর টলানিটা কমল। প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় সমাজপতি বললেন, আমার অবস্থা তো দেখছেন। মরতে-মরতে বেঁচে আছি। আপনাদের সেবা করি বলে ওরা আমাকে মেরে ফেলেছিল!

কারা-কারা? সমস্বরে চিৎকার উঠল।

মাথা নাড়লেন সমাজপতি—বলা নিষেধ, আদালত অবমাননা হবে। যা হোক, আমার আবেদন, অপপ্রচারে ভুলবেন না। এটা যখন সভা, আমাদের প্রাক্তন ডাক্তারবাবু যখন সভায় কিছু বলতে চেয়েছেন তখন এই সভার একজন সভাপতি থাকা উচিত। আমি প্রস্তাব করছি শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা গুপ্তসাহেব এই সবার সভাপতির পদ গ্রহণ করুন।

সমর্থন করছি, সমর্থন করছি। সমস্ত হল একসঙ্গে জানাল।

এরপর নতমস্তকে মঞ্চে উঠে এলেন গুপ্তসাহেব। খুব বিনীতভাবে নমস্কার করে তিনি অপরেশকে মঞ্চে আহ্বান করলেন। অপরেশ সপরিবারে এতক্ষণ একপাশে অপেক্ষা করছিলেন। এবার ধীরে-ধীরে মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রোতারা চুপ করে গেল। তারা অপরেশকে দেখছিল।

গুপ্ত মাইকের সামনে এসে বললেন, বন্ধুগণ! এখানে এই সভায় বক্তৃতা করার কোনও বাসনা আমার ছিল না। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আজকের এই সভা তাকে এড়িয়ে যাওয়া আমি কর্তব্যের গাফিলতি বলেই মনে করি। কনকপুর ডেভেলপমেন্টের প্রধান হিসেবে আমি তাই এসেছি। আমার ভাই এবং প্রাক্তন ডাক্তার মনে করেন এই শহরের জল দূষিত। অথচ আমরা বেশ ভালোভাবেই রয়েছি। এই জল নিয়ে অভিযোগ পাওয়ার

পর আমি পরীক্ষা করিয়ে কোনও বিরূপ ফল পাইনি। আমি মনে করি এটা অপপ্রচার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আপনারা তো জানেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভাই হয়ে ভাইয়ের ক্ষতি করার ঘটনা খুবই স্বাভাবিক।

শেম, শেম! চিৎকার করে উঠল জনতা।

আমি এই শহরকে রক্ত দিয়ে তৈরি করেছি। পাহাড় কেটে আমার চোখের সামনেই শহরটা গড়ে উঠল। আমি চাইব না এই শহরের সামান্য ক্ষতি হোক। জল যদি দূষিত হতো তাহলে আমিই তার ব্যবস্থা নিতাম। অতএব বন্ধুগণ, আমি প্রস্তাব করছি, এই সভা মনে করে কনকপুরের জল স্বাস্থ্যকর এবং তা নিয়ে যে-কোনও অপপ্রচার ঘৃণার যোগ্য।

সমাজপতি বলে উঠলেন, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল লক্ষ পায়রা যেন হলঘরে উড়ছে। হাততালি থেমে গেলে গুপ্ত আবার বললেন, কিন্তু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি বেঁচে থাকার অধিকার যেমন সকলের সমান তেমনি কথা বলারও সমান অধিকার আছে সকলের। তাই এবার ডাক্তারের মুখে আপনারা তাঁর কথা শুনুন। অনুরোধ করছি আপনারা অধৈর্য হবেন না।

গুপ্ত অপরেশকে ইঙ্গিত করে পিছনের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অপরেশ যেই উঠতে যাবেন, অমনি চিৎকার শুরু হল।

মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তে নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর গলা তুলে বললেন, বন্ধুগণ! আপনারা আমার কথা শুনুন। আমি যে কথা বলতে এসেছি তা আমার কোনও স্বার্থ মেটাতে নয়। আপনাদের জন্যে, আপনাদের বিপদের কথা ভেবে এই সভা ডাকা হয়েছে।

কী এমন পরোপকারী রে! কে একজন চিৎকার করে উঠলেও শ্রোতারা শব্দ কমাল। অপরেশ বললেন, আপনারা জানেন আমি এই শহরের ডাক্তার ছিলাম। আপনারা আমার কাছে আসতেন চিকিৎসার জন্যে। কিছুদিন থেকে লক্ষ করছিলাম অনেকেই পেটের গোলমালে ভুগছেন। সন্দেহ হওয়ায় জল পরীক্ষা করালাম। এই জলই হল সমস্ত গোলমালের মূলে। আমাদের শহরের খাবার জল আসে লেক থেকে। পরিশ্রুত সেই জল পাইপে করে বাড়িতে-বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক লেকের কাছেই একটি চামড়ার কারখানা আছে। তার নোংরা জল কোনওক্রমে পাইপের জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এখন সেই পরিমাণ কম, কিন্তু আরও বেশি মিশলে শহরের সব জল বিষাক্ত হয়ে যাবে। অপরেশ দম নেওয়ার জন্যে থামতেই একটা বড় গুঞ্জন উঠল। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা! আমাদের কনকপুরের জলের এত সুনাম আর ডাক্তার তার উলটো কথা বলছে।

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, বিপ্লবী এসেছে রে!

অপরেশ আবার বলা শুরু করলেন, না, আমি বিপ্লবী নই। আমি যা বলছি তা বৈজ্ঞানিক মতে সত্যি। আমি কলকাতা থেকে জল পরীক্ষা করিয়ে এনেছি। জীবাণু দেখতে পেয়ে আমি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কিন্তু তাঁরা গুরুত্ব দেননি। এইভাবে কিছুদিন চললে এখানে মহামারী দেখা দিতে বাধ্য। তাই বন্ধুগণ, আজকের এই সভায় আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে যাতে আমরা ভালো জল পাই। এর দুটো উপায়

আছে। এক ঃ শহরের সমস্ত জলের পাইপ পালটে ফেলা। মনে হয় ওগুলোকে মরচে পড়ে গেছে। দুই ঃ ওই চামড়ার কারখানাকে তুলে দেওয়া। আপনারা আমার পাশে এসে দাঁড়ান, আসন্ন সর্বনাশ থেকে শহরকে রক্ষা করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন। সমস্ত হলঘর এবার নিশ্চুপ হয়ে গেল। অপরেশের মনে হল জনতা তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করতে পেরেছে।

এই সময় গুপ্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। ইঙ্গিতে অপরেশকে সরিয়ে মাইক হাতে নিলেন, বন্ধুগণ, আমার ডাক্তার ভাই যে এত চমৎকার বক্তৃতা করতে পারেন জানা ছিল না। আমার প্রথম প্রশ্ন, এই জল বিষাক্ত তার প্রমাণ কী? তিনি কোনও রিপোর্ট দিতে পারেননি। এরকম অপপ্রচারের ফলে ট্যুরিস্টরা যদি এখানে না আসেন তাহলে আপনাদের ব্যবসা মার খাবে। আপনারা কী বলেন? জলের পাইপ পালটানোর কথা বলছেন উনি। আমি মনে করি না এই শহরের জলের পাইপ খারাপ হয়েছে। কোথাও হয়তো সামান্য লিক করতে পারে, কিন্তু সে তো মেরামত করে নিলেই চলবে। তা ওঁর আবদার মতো যদি জলের পাইপ পালটাতে হয় তাহলে আমাদের কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই টাকাটা কোত্থেকে আসবে? জলের পাইপ পালটাতে হলে আপনাদের অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হবে। তার পরিমাণ মাথাপিছু চারশো টাকা। উনি চামড়ার কারখানার কথা বললেন। আমরা দেখছি ওই কারখানা অত্যন্ত যত্নে পরিচালিত হয়। কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। শুধু সন্দেহের বশে যদি কারখানা সরিয়ে নিতে বলা হয় তাহলে প্রায় একশো পরিবার বেকার হবে। কারণ আমাদের অনেক অনুরোধে দাশগুপ্ত এখানে কারখানা করেছেন। বিরক্ত হয়ে তাঁর পক্ষে সমতলে চলে যাওয়া স্বাভাবিক। তিনি এখানে থেকে চলে গেলে কনকপুরের ওপর ভীষণ অর্থনৈতিক চাপ আসবে। এসব সত্ত্বেও আপনারা যদি চান তো ডাক্তারের পাগলামি আমরা মেনে নেব। দু-হাত দু-দিকে বাড়িয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন গুপ্ত।

এবার বিস্ফোরণ হল। যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে শ্রোতাদের গায়ে— পাগলটাকে বের করে দাও, তাড়িয়ে দাও কনকপুর থেকে। চারধারে এমন একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল যে অপরেশ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। সুব্রত এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি আবার মাইকের সামনে যেতে চাইলে গুপ্ত তাঁকে বাধা দিলেন, কী আরম্ভ করেছ? দেখছ না পাবলিক তোমাকে অপছন্দ করছে। আমাকে সামলাতে দাও। বন্ধুগণ, আপনারা এরকম উত্তেজিত হবেন না। আমাদের ঠান্ডা মাথায় সব ভাবতে হবে। আমি অনুরোধ করছি আপনারা শান্ত হন।

বারংবার আবেদনের পর জনতা একটু ঠান্ডা হলে সামনের সারিতে বসা একটা লোক উঠে দাঁড়াল, আমি কর দিই, তাই একটা কথা বলব।

তারপরেই উত্তরে অপেক্ষা না করে বলে উঠল, আমি জল খাই না, জলে বিষ থাকল কি না থাকল তাতে বয়েই গেল। ডাক্তারবাবু যদি জলের বদলে পাইপে মাল চালান দেয় তা হলে আমি ওঁর দলে আছি। এই হল গিয়ে আমার কথা। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই হো-হো করে হাসতে লাগল, কয়েকজন জোর করে লোকটাকে মাটিতে বসিয়ে দিল। লোকটা চেঁচাতে লাগল, আমার গণতান্ত্রিক অধিকার—

মাইকে তখন গুপ্তর গলা শোনা গেল, হ্যাঁ, গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেটা

প্রয়োগ করার সময় মনে রাখতে হবে অন্যের ক্ষতি যেন না হয়। ডাক্তারকে আমরা সেই অধিকার দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তার বদলে কী করলেন? না, মিথ্যে কথা বললেন। বন্ধুগণ, মনে রাখবেন তিনি আমার ভাই, দয়াপরবশ হয়ে পুরুলিয়ায় গ্রাম থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে এসে এই শহরের ডাক্তারের চাকরিতে দিয়েছিলাম শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে। কিন্তু তিনি যখন আপনাদের ক্ষতি করতে চাইছেন তখন আমি তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না। প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে গুপ্ত বললেন, তাই আমি প্রস্তাব করছি, অবিলম্বে তিনি এই শহর পরিত্যাগ করুন। এই সভা তাঁকে এই জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিল।

শেষপর্যন্ত পুলিশের গাড়িতে তাঁদের বাড়ি ফিরতে হল। অপরেশ বিধ্বস্ত, মাথা তুলতে পারছেন না। আসার সময় জনতা তাঁকে বিদ্রূপ করেছে। মাথা নিচু করে নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। সুব্রত কথা বলছিল না। কাজল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

সুর্মা বলল, বাবা, তুমি ভেঙে পড়ো না। চললেন কাল সকালে আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাই। অপরেশ উত্তর দিলেন না। সুব্রত এবার বলল, কাকাবাবু আমরা তো আছি। আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

অপরেশ এবার মুখ তুললেন—তোরা আমাকে পালিয়ে যেতে বলছিস! সুর্মা বলল, পালানোর কথা বলছ কেন? এখানকার মানুষ তোমার কথা বুঝবে না। অর্থের ওপর হাত পড়লেই এরা অন্ধ হয়ে যায়। তার চেয়ে যেখানে গিয়ে তুমি মনের মতো কাজ করতে পারবে সেখানে চলে যাওয়াই তো ভালো। এবার কাজল কথা বললেন, সে-রকম জায়গা কোথায় আছে?

জানি না। কিন্তু পৃথিবীতে ভালো মানুষও তো আছে। যেমন প্রয়োজন যদি হয় তবে আমরা জঙ্গলের আদিবাসীদের কাছে যাব। ওরা সরল। এই শহর করতে গিয়ে আমরা ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। সুর্মা উত্তেজিত গলায় জবাব দিল।

আর সেই সময় পাশের জানলার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। ঘরের মধ্যে ছিটকে এল একটা বড় পাথর। মেয়েরা আর্তনাদ করে উঠতেই সুব্রত ছুটে গেল বাইরে। আর ঠিক তখনই আর-একটা পাথর এসে পড়ল অপরেশের মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। কাজল চিৎকার করে ছুটে এলেন। নিজের আঁচল স্বামীর মাথায় চেপে ধরে বললেন, এ কী হচ্ছে? কে ঢিল ছুড়ছে!

অপরেশ বিহ্বল ভাবটা কোনওক্রমে কাটিয়ে উঠে বললেন, এ সব তো এখন হবেই। সুর্মা, মা, যা ব্যান্ডেজ আর তুলো নিয়ে আয়।

অপরেশের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা হলে সুব্রত ফিরে এল। এসে চমকে উঠল, এ কী! কী হয়েছে আপনার?

ও কিছু না। কী দেখলে?

দুটো লোক। অল্পের জন্য ধরতে পারলাম না।

চেনো?

না। সাধারণ লোক। আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ওরা?

হুম!

কাদের জন্যে আপনি এত ভাবছেন? যাদের উপকার করতে আজ আপনার চাকরি

গেল, অপদস্থ হলেন, তারাই আপনাকে আহত করল।

অপরেশ হাসলেন—সুব্রত! পৃথিবীর নিয়মই তো এটাই। কিন্তু ওরা জানে না কী সর্বনাশ আসছে ওদের। না-না, পালিয়ে যেতে পারব না আমি। ওদের বাঁচাতেই হবে আমাকে।

কাজল জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে? কেউ তো তোমার কথা শুনছে না। অপরেশ উঠে দাঁড়ালেন—রাস্তা আছে। তোমরা যদি চাও তো শহর ছেড়ে চলে যেতে পারো।

সুর্মা বলল, তোমাকে ফেলে আমরা চলে যাব ভাবছ কী করে?

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু রাস্তাটা কী?

অপরেশ ধীরে-ধীরে ভাঙা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, দেখো কী সুন্দর আকাশ, কত পবিত্র। আজও কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। আমার তো দিন ফুরিয়ে এল, কিন্তু তোমাদের এখনও অনেক পথ যেতে হবে। চোখ খোলা রেখো, দেখবে নোংরা যেমন আছে সুন্দর পবিত্র জিনিসেরও অভাব নেই পৃথিবীতে। সুর্মা চাপা গলায় বলল, বাবা!... অপরেশ এগিয়ে এসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন—তোর ওপর ভরসা আছে মা। তুই কখনও ভুল করিসনি। কাজল, তোমার কি মনে আছে কিছু দিন আগে একটা লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কোমরে গুলি খেয়ে!

কাজল বললেন, হ্যাঁ, লোকটা ডাকাত। মরে গিয়েছিল তো!

হ্যাঁ। ও না মরলে পুলিশ ওকে ফাঁসিতে ঝোলাত। সেই লোকটা মরার আগে একটা কথা বলে গিয়েছিল আমাকে। প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল পুলিশকে যেন খবরটা না দিই। আজ আমি সেই খবরটাকে কাজে লাগাব। অপরেশের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।...কী খবর? কাজল প্রশ্ন করলেন।

কিছু গড়তে গেলে ভাঙতেই হয়। না হলে এই শহরের মানুষকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। আমি চলি। অপরেশ পা বাড়ালেন।

কোথায় যাচ্ছ? কাজল এগিয়ে এসে ওঁর হাত ধরলেন।

বললাম তো, এই শহরের মানুষকে বাঁচাতে। ডাকাতটা বলেছিল, ও পাহাড় ভাঙার ডিনামাইট চুরি করতে এসেছিল। ওর সঙ্গীও ভয়ে পালিয়েছে। ও একটা বাক্স উত্তর পাহাড়ের মাঝখানে তিনটে সাদা পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে কীভাবে যেতে হয় আমি জানি। অস্বাভাবিক হাসলেন অপরেশ।

কী করবে ডিনামাইট দিয়ে? কাজল হাত ছাড়ছিলেন না।

অহিংস পথে তো হল না। ওই ডিনামাইট দিয়ে আমি চামড়ার কারখানা উড়িয়ে দেব। তাতে জলের পাইপও আস্ত থাকবে না। তখন ওরা বাধ্য হবে পাইপ পালটাতে আর কারখানা সরাতে।

কিন্তু যদি ডাকাতটা মিথ্যে কথা বলে থাকে! যদি সেখানে ওরকম বাক্স সে না লুকিয়ে রাখে! উত্তেজনায় সুর্মা এগিয়ে এল।

না মা, মৃত্যুপথযাত্রী কখনও মিথ্যে কথা বলে না।

সুব্রত বলল, কাকাবাবু, আপনি থামুন, দায়িত্বটা আমাকে দিন।

অপরেশ হাসলেন, না হে। তুমি কেন, আমিই যাব। তোমার সামনে এখন কত

উজ্জ্বল দিন, তুমি কেন যাবে?

কাজল বললেন, বেশ। তা হলে আমি যাব তোমার সঙ্গে!

তুমি! বিস্ময়ে তাকালেন অপরেশ।

হ্যাঁ। তোমার একার পক্ষে সব কাজ হয়তো সম্ভব হবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করব। কাজল জোরের সঙ্গে বলে স্বামীর হাত ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু পাহাড়ের পথ কষ্টকর, তা ছাড়া, ধরা পড়ার যথেষ্ট ভয় আছে।

দুজনে থাকলে সে সম্ভবনা কম। লোকে সন্দেহ করবে না।

কিন্তু এর পরিণামের কথা জানো? আমরা আর না-ও ফিরতে পারি।

সে তো খুবই ভালো। দুজনেই একসঙ্গে যাব। কেউ কারও জন্য কাঁদব না। শুধু যাওয়ার আগে জেনে যাব আমরা হাজার-হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে গেলাম। না গো, তুমি আর না বলো না। মা হিসেবে এই দায়িত্বটুকু পালন করতে দাও।

সেই কনকনে ঠান্ডায় কনকপুরে সেদিন মানুষেরা যে যার ঘরের মধ্যে। হিম বাতাস চারপাশে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। আকাশে সাদাটে চাঁদের হাড়ে হয়তো ঘুণ লেগেছিল, কারণ, কুয়াশারা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। দুটো প্রৌঢ় শরীর যা পৃথিবীর জল-হাওয়ায় জীর্ণ হতে চলেছে, ওই অন্ধকারে তারুণ্য নিয়ে দ্রুত যাচ্ছিল উত্তরের পাহাড়ের দিকে। এই ঘুমন্ত শহরটাকে বাঁচাবার জন্যে ডিনামাইট দরকার। এই রাত্রেই।

(হেনরিক ইবসেনের নাটক 'এনিমি অফ দি পিপল'-এর অনুপ্রেরণায় রচিত উপন্যাস)